ভূমিকা

বাংলা দেশে মেয়েরা গালগল্প এবং উপকথা অনেকে লিখেছেন এবং অনেক লিখেছেন কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাসের সাধনায় তাঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ কেউ অগ্রসর হয়েছেন। তাই কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী গুপ্তের 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বইখানি দেখে এক সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করলাম। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের ইতিহাসের গল্প শোনাবার ব্রত আমার সাহিত্য সাধনার গোড়ার দিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। ভিন্ন আকর্ষণে আমি আজ অন্য পথের পথিক হ'লেও মনে মনে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ আমার সমানই আছে। তাই ছেলেমেয়েদের ইতিহাস শেখানোর কাজে শ্রীমতী বাণীর মত একজন শিক্ষিতা সুলেখিকা অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমি তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। তাঁর সাধনা সুদূর প্রসারী হোক এবং দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের সত্য কাহিনী শোনবার অবকাশ পেয়ে ধন্য হোক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল শাসন এক বিরাট অধ্যায়। তাঁর সংস্কৃতি ও সভ্যতা, তার রাজ্য শাসনপদ্ধতি দেশকে উন্নতির পথে পরিচালনা করেছে। বাংলা দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সেই গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই "ছেলেদের জাহাঙ্গীর" প্রকাশ করেছিলাম, আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এই পর্য্যায়ের অন্য কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছি এবং ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে আমার এই প্রথম বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইখানি লেখার জন্য আমি Memoirs of Jahangir, Smith এর The Oxford History of India, স্যর টমাস রো'র 'Journal', অধ্যাপক বেণীপ্রসাদের Jahangir—প্রভৃতি বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছি। ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক করার জন্য বইখানিতে কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশ করেছিলাম। এই দ্বিতীয় সংস্করণে নূরজাহানের এক খানি বহু-বর্ণের দুষ্প্রাপ্য প্রতিলিপি দেওয়া হল। মূল চিত্রগুলি সবই প্রাচীন মোগল চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত।

বইখানি যাদের জন্য লেখা, তাদের ভাল লেগেছে জেনে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করছি।

—লেখিকা

উৎসর্গ

স্নেহের সুপ্রিয় !

ইতিহাসের কথা শুনতে তুমি ভালবাস, তাই তোমার আর তোমারই মত ইতিহাসপ্রিয় বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে এই বইখানি তুলে দিলাম।

নয়াদিল্লী
১লা আশ্বিন, ১৩৫৫

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
মাসীমা

ছেলেদের জাহাঙ্গীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৫৬৯ খৃঃ ৩০শে আগষ্ট বুধবার দ্বিপ্রহরে সম্রাট আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময়ে বাবর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য এক বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশ ছাড়া সমগ্র সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকা আকবর আপন হস্তে শাসন করতেন। সুদূর কাবুলের পরেও তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কেবল মাত্র রাজপুতনা বীরত্বে ও মহত্ত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অপূর্ব্ব আদর্শের সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতির তৈরী দুর্ভেদ্যতায় দুরধিগম্য রাজপুতনা বিপুল সম্মানের অধিকারী তখন। কিন্তু মুঘল শক্তির দুর্ব্বারতা তাকেও আপন আয়ত্তে এনেছিল ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। স্বাভাবিক দূরদর্শিতার সাহায্যে আকবর উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে যে মুঘল

জাতি ভারতবর্ষের সিংহাসনে আপন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে কখনই সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হ'তে পারবে না যদি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ জাতি গুলির সঙ্গে তার অন্তরের মিল না ঘটে। এটা তিনি স্থির জেনেছিলেন যে, বাহুবল ও জনবলের দ্বারা সাময়িক ভাবে পরাজিত হ'লেও রাজপুত জাতি নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে সেদিনের যেদিন আবার সে আপন শক্তিতে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারবে। তাই আকবর চেষ্টা করলেন রাজপুত জাতির বন্ধুত্ব লাভের জন্য। এই বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রথম পর্য্যায় হিসাবে তিনি অম্বর রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথম রাজপুত ও মুঘলের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইতিহাসে এই রাজনৈতিক বিবাহ যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল সেকথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই।

এইভাবে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হ'য়ে আকবর সুশাসন ও শৃঙ্খলার দ্বারা রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে সৌভাগ্যবান হ'লেও আকবর পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না। তাঁর অনেক সন্তানই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সেজন্য আকবরের অশান্তির সীমা ছিল না। পাহাড় ও সমুদ্র বেষ্টিত বিপুল বিশাল ঐশ্বর্য্যশালিনী এই রাজ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর জন্য তিনি ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বর ও দরবেশের কাছে প্রার্থনা জানাতেন।

এই সময়ে সেখ সেলিম নামে একজন জ্ঞানী ও সাধু দরবেশ আগ্রার নিকটে ছোট গ্রাম সিক্রীর পাহাড়ের কাছে বাস

কথতেন। পুত্রলাভের আশায় আকবর ভক্তি আর্দ্র চিত্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। দরবেশ সম্রাটের ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় প্রীত হয়ে তাঁকে পুত্রলাভের আশীর্ব্বাদ করেন। আকবর প্রতিশ্রুতি দেন যে দরবেশকে তাঁর প্রথম পুত্র তিনি উৎসর্গ করবেন। অবশেষে সত্য সত্যই আকবরের বেগম রাজপুত রাজকন্যা মরিয়ম উজ যামিনীর সন্তান সম্ভাবনা হল। সন্তান জন্মের পূর্ব্বে বেগমকে সম্রাট সিক্রীর দরবেশের গৃহে প্রেরণ করেন। সেইখানেই জন্মগ্রহণ করেন মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সম্রাট আকবরের প্রথম পুত্র। দরবেশ নবজাত শিশুর নামকরণ করলেন তাঁরই নামে। তাঁর নাম হল মুহম্মদ সুলতান সেলিম। আকবর দরবেশের আশীর্ব্বাদে পাওয়া পুত্রকে আদর করে ডাকতেন সেখু বাবা। সেলিমকে অন্য কোনও নামে ডেকে তিনি তৃপ্তি পেতেন না। সেলিমের জন্মের সঙ্গেই আগ্রায় আকবরের কাছে শুভ সংবাদ প্রেরণ করা হল। সমস্ত রাজধানীতে সাড়া পড়ে গেল গভীর আনন্দের ও উৎসবের। সাতদিন ধরে আনন্দ উৎসব, দানব্রত, ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি পুণ্যকাজে আকবর সময় অতিবাহিত করলেন। আবুল ফজল এই উৎসবকে লক্ষ্য করে বলেছেন "আনন্দে পরিপূর্ণ হল সমস্ত রাজ্য।" খাজা হুসেন এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর কবিতা লিখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন—

"কালের সমুদ্র হ'তে ভেসে এসেছে তীরভূমিতে একটি শুভ্র নিটোল মুক্তা!

অভাবই বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অবশেষে ১৫৮২ খৃঃ কৃত্রিম হ্রদের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় সকলের প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠল এবং সকলে সিক্রী পরিত্যাগ করা স্থির করলেন। ১৫৮৫ খৃঃ রাজধানী আবার আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শাহজাদা সেলিমের শৈশবের ক্রীড়াভূমি ছিল এই সিক্রী। সিক্রীর পুষ্পোত্থানে, হ্রদের তীরে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁর জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হয়। যে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তাঁর শিশুমন গড়ে উঠেছিল, তাই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে তাঁকে এত বেশী সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাটে পরিণত করেছিল। সন্তানদের প্রতি আকবর অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁদের শিক্ষার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। মুসলমান রীতি অনুসারে চার বছর চার মাস চার দিন অতিবাহিত হলে শাহজাদা সেলিমের শিক্ষা সুরু হল। ১৫৭৩ খৃঃ এর ১৮ই নবেম্বর মৌলানা মীর কলন হরবী শাহজাদার শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন।

তৈমুরের বংশে শিক্ষানুরাগ আদর্শস্থানীয়। তৈমুর লঙ্ পৃথিবীতে নৃশংস অত্যাচারীরূপেই পরিচিত, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিকও ছিল। সে দিক হল তাঁর বিত্থানুরাগের দিক। ঐতিহাসিক গিবন সাহেব বলেছেন পার্শী ও তুর্কী ভাষায় তৈমুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সিরাজ নগর

ধ্বংসের সময়ে কবি হাফিজের জীবন ও সম্পত্তি তাঁরই আদেশে রক্ষা পেয়েছিল। সমরখন্দ ও বোখারাকে তৈমুর বিখ্যাত সংস্কৃতি ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

তৈমুরের পরে তাঁর বংশধরেরা বংশের এই শিক্ষা গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তৈমুরবংশের ইতিহাস তাই কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকে সমৃদ্ধ। বাবর ভারতবর্ষে এই তৈমুর বংশের ধারাকে নিয়ে এসেছিলেন। বাবরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পাই তাঁর লেখা আত্মজীবনীতে। এ ছাড়াও সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা তাঁর শিক্ষিত মনের পরিচয় অন্য বহু রকমে পেয়েছিলেন। তুর্কী ভাষায় অনেক সুন্দর সহজ ও সরল কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। আইন সম্বন্ধে তাঁর লেখা পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বাবর এক বিশেষ ধরণের হস্তলিপিতে কোরাণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বটে কিন্তু পুত্র হুমায়ুনের শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, জ্যোতিষ ও ভৌগলিক বিদ্যায় হুমায়ুন যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করেন। আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক হুমায়ুনকে আলেকজাণ্ডারের উৎসাহ এবং আরিষ্টোটলের জ্ঞানের সম্মিলিত মূর্ত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পুস্তকাগার সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। যুদ্ধক্ষেত্রেও তার

ব্যতিক্রম হ'তনা। এমন কি যে দিন সর্ব্বস্ব হারিয়ে তিনি পারস্যের পথে পলায়ন করেছিলেন, সেদিনও তাঁর সঙ্গে তাঁর অতিপ্রিয় পুস্তক সম্ভার ছিল। সমস্ত জীবন দুর্য্যোগের মধ্যে অতিবাহিত হ'লেও পুত্র আকবরের শিক্ষার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। পুত্রের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল।

"অলস হয়ে বসে থেকোনা,
জীবন খেলার নয়;
জীবন হ'ল সৌন্দর্য্য ও কর্ম্মের
সাধনার জন্য।"

আকবরের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয় চরম বিপদ, দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে। সেজন্য পিতা ও পিতামহের মত বিদ্যাচর্চ্চার অবকাশ তিনি পান নি। আকবর নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন বটে, অশিক্ষিত ছিলেন না। আকবর তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যুগে তাঁর তীব্র জ্ঞানস্পৃহার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। শ্রবণশক্তির সাহায্যে তিনি জ্ঞান অর্জ্জন করতেন। সত্যকে জানবার জন্য তাঁর কামনা ছিল অদম্য। আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম অনুশীলন করেছিলেন। ফতেপুর সিক্রীতে ছিল তাঁর প্রশস্ত বিতর্ক সভাগৃহ। নাম ছিল তার ইবাদৎ খানা। সেখানে এসে মিলিত হতেন সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা। সুদীর্ঘ রাত্রি জাগ্রত থেকে আকবর একাগ্রচিত্তে নানাবিষয়ে আলোচনা

শুনতেন, তর্কে যোগ দিতেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ পারস্যভাষায় অনূদিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে রাজতরঙ্গিণী, পঞ্চতন্ত্রম, অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শাহজাদা সেলিম এই আকবরের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র। সুতরাং তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আকবর যে অত্যন্ত বেশী উদ্যোগী হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। পুত্রের শিক্ষক নির্ব্বাচনে আকবর তাঁর স্বাভাবিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মৌলানা মীর কলন হরবী একজন প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌হিসাবে তাঁর যশ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত ছিল। মৌলানা সাহেবের চরিত্র সুদৃঢ় এবং উদার ছিল। শোনা যায় তিনি তাঁর চারিত্রিক বল তাঁর মায়ের নিকটে পেয়েছিলেন। মৌলানা সাহেব যখন মারা যান তখনও তাঁর মা বেঁচে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন একশত বৎসর। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন জননীর কাছে পৌঁছিল তখন তিনি কোরাণ পাঠ করছিলেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদে তিনি কোরাণ থেকে একটি লাইন উদ্ধৃত করে' বলেন—"আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি, তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাই।" তারপর একাগ্রমনে আবার কোরাণ পাঠ করতে থাকেন। জননীর এই সুদৃঢ় মানসিক বল পুত্রের চরিত্রকেও অলঙ্কৃত করেছিল। জননীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হিরাট থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জননীর কোনও দুঃখের কারণ হ'তে পারে এই আশঙ্কায় তিনি বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নি। সেলিমের শিক্ষকরূপে যখন তিনি নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর বয়স

৭৮ বৎসর। বিদ্যারম্ভের দিন মুসলমান প্রথানুসারে শিক্ষক তাঁর ক্ষুদ্র ছাত্রটিকে প্রজাদের জয়ধ্বনির মধ্যে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। উৎসবে তাঁদের দিকে নানারকম মূল্যবান রত্ন ও ফুল ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল। অবশেষে ঈশ্বর ও কোরাণের নাম উচ্চারণ ক'রে শাহজাদাকে অক্ষর পরিচয় করানো হল। এইভাবে সেলিমের শিক্ষা সুরু হ'ল বটে কিন্তু তাঁর পরম দুর্ভাগ্য বশতঃ পরের বৎসর মৌলানা সাহেব মারা যান।

এর পরে আকবর আবদর রহিম খাঁ নামে একজন জ্ঞানী পণ্ডিতকে পুত্রের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনি বৈরাম খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর আগ্রার সিংহাসনের আশ্রয়ে থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পার্সী, আরবী, তুর্কী, সংস্কৃত এবং হিন্দীতে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। কবি হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বাবরের আত্মজীবনী তিনি পার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। আবদর রহিম কেবলমাত্র জ্ঞানার্জ্জন নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন নি। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। সাম্রাজ্যের অনেক ব্যাপারেই তিনি আপনার গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আকবর সেলিমের শিক্ষার ভার আবদর রহিমের মত সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন একজন লোকের পরে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। ১৫৮২ খৃঃ সেলিম সর্ব্বপ্রথমে এই শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্রবে আসেন। শাহজাদা পার্সী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করেন। সেলিম হিন্দী সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় কাব্যসাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মে। পরবর্ত্তীকালে সেলিম কবিতা রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করেন। গল্প ও কাহিনী শুনতে তিনি ভালবাসতেন, নিজেও সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গল্প বলতে পারতেন।

তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক—ই—জাহাঙ্গীরি'তে তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন "আমার নিজের বিশেষ কাব্য-প্রতিভা ছিল। সময়ে সময়ে ইচ্ছা করে, আবার কখনও বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি কবিতা রচনা করতাম।" কবিদের তিনি বিশেষ সমাদর করতেন। মাঝে মাঝে উৎসব সভা আহ্বান করে প্রত্যেক অতিথিকে দিয়ে তিনি কবিতা লেখাতেন।

কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্য বা কাব্য নিয়ে সেলিম সময় কাটাননি। পরবর্ত্তী কালে তাঁর আত্মজীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে তিনি ইতিহাস ও ভূগোলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছিলেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ত্বেও তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। নানাবিষয়ে আলোচনা করতে তিনি ভাল বাসতেন।

এই সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতিতে মুঘল রাজবংশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছিল। সেলিম রাজবংশের এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উৎসাহে ভারতীয় চিত্রকলা উৎকর্ষ লাভ করে। মূল্যবান সুন্দর পাথর,

কারুকার্য্য খচিত তরবারি, জমকালো পোষাক তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগ। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি ফুল, নদী, পাহাড়, আকাশ প্রভৃতিকে কবির সৌন্দর্য্যময় ভাষায় বর্ণনা করে' গেছেন। ছোট একটি বনফুল, ছোট একটি আঁকাবাঁকা পাহাড়ে নদী, উদার আকাশের নীচে ধূসর পাহাড় দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চাও করতেন। এইভাবে তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য সুগঠিত হয়ে উঠিল। আকবরের স্বাস্থ্য ছিল অনমনীয়, লোহায় গড়া। রাজপুত কন্যা সেলিম জননীও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বভাবতই সবল ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দেহকান্তি তাঁর সুশ্রী ছিল। বাল্য ও কৈশোরে তিনি পূর্ণস্বাস্থ্য উপভোগ করেছিলেন। উন্মুক্ত হাওয়ায় ব্যায়াম করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল শিকার করা। শিকারের উত্তেজনা তিনি উত্তারাধিকার সূত্রে পিতার নিকট হ'তে পেয়েছিলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়স হ'তেই তিনি শিকারে যাওয়া অভ্যাস করেছিলেন। সিংহ শিকারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। শিকারে বহুবার তিনি বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু কখনও ভীত বা পশ্চাদপদ হন নি। যৌবন এবং প্রৌঢ় বয়সে শিকারে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন।

মুঘল রাজবংশের রীতি অনুযায়ী বাল্য কাল হ'তেই রাজকুমারেরা সাধারণ রাজকার্য্যের সংস্রবে আসতেন। এতে তাঁদের

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহ শিকার

ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খুব সুবিধা হত। কাবুল অভিযানে আকবর সেলিমকে কার্য্যভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানের কাজ তিনি বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে করেছিলেন। এরপরে সেলিম রাজ্যের সাধারণ বিচার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হন। সর্ব্বোপরি সেলিমের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা কূটরাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আকবর।

ঐশ্বর্য্যের মাঝে জন্মগ্রহণ করার একটি বিশেষ কুফল আছে। ঐশ্বর্য্য মানুষের চরিত্র গঠনে বিঘ্ন ঘটায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর উদাহরণের অভাব নেই। শাহজাদা সেলিমও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাবর, হুমায়ূন ও আকবরের প্রতিভা দুঃখ দুর্দ্দশার তীব্র কশাঘাতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। সেলিমের সে সৌভাগ্য হয়নি। যৌবনের মধ্যভাগ পর্য্যন্তও তিনি কোনও বিঘ্ন বা বিপদের সম্মুখীন হননি, যাতে তাঁর স্বাধীন বিচার বুদ্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন হ'তে পারে। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের অতি আদরের কুমার সেলিম অপরিমেয় প্রশ্রয় ও আদরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর প্রথম জীবন। বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিশাল রাজশক্তি সমস্তই তাঁর সামান্যতম কামনা পূরণের জন্য উদগ্রীব ছিল। সিক্রীর মনোহর পুষ্পোদ্যানে, সজ্জিত রাজপ্রাসাদে বর্দ্ধিত কুমার জীবনের পথে গোলাপের কোমল পাপড়ি ছড়ানো দেখেছিলেন। জীবনের চরম দুর্য্যোগ ও দৈন্যের মাঝে যে শক্তি ও সাহস জেগে ওঠে—যে দুঃখের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে শাহাজাদা সেলিম সেই

দুঃখময় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাই শিক্ষার' সহস্র ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষা ছিল অসম্পূর্ণ। চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতিরিক্ত সুরাপানের দোষ। তৈমুরের বংশধরেরা সকলেই সুরা পান করতেন। সেলিম সপ্তদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুরা পান করেন নি। শিকারের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি প্রথম সুরাপান করেন। ক্রমশঃ সেই অভ্যাস অতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে তোলে। এই পানদোষ থেকে যদি তিনি আপন চরিত্রকে মুক্ত করতে পারতেন, নিঃসন্দেহে তাহলে মুঘল ইতিহাসের অনেকখানিই পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই সেলিম অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাইএর সঙ্গে বাগদত্ত হলেন। সম্রাট আকবর স্বয়ং এই বিবাহ উপলক্ষ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে রাজা ভগবান দাসের রাজপ্রাসাদে যান।

১৫৮৫ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী মুসলমান কাজির দ্বারা এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, তবে এই বিবাহে কয়েকটি হিন্দুপ্রথাও প্রতিপালিত হয়েছিল। এই বিবাহে ভগবান দাস সম্রাটকে একশতটি হস্তী, অশ্ব, রত্ন, মূল্যবান প্রস্তর খচিত বহু স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহু দ্রব্যাদি দান করেন। রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ বলিষ্ঠ অশ্ব ও স্বর্ণ জিন উপহার পান। কন্যার সঙ্গে দেওয়া হল দাস দাসী ও প্রচুর রত্নালঙ্কার। সম্রাট বধূর শিবিকার উপরে স্বর্ণ ও মণিমুক্তা প্রভৃতি রত্ন বর্ষণ করে আশীর্ব্বাদ করলেন সেলিমের বধূকে।

সেলিম এরপরে আরও অনেক বিবাহ করেছিলেন। সর্ব্বশেষে বিবাহ করেন মেহের উন্নেসা বা নূরজাহানকে।

১৫৮৭ খৃঃ ৬ই আগষ্ট সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৯২ খৃঃ ৫ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খুরম। খুরম শব্দের অর্থ আনন্দময়। ভবিষ্যতে ইনি দীর্ঘকাল স্থায়ী আনন্দময় রাজত্ব উপভোগ করেছিলেন।

এরপরে জাহাঙ্গীরের আরও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তাঁদের নাম জাহান্দর, শাহরীয়ার ও পারভেজ।

আকবর রাজনীতি ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক দূরদর্শিতা ও কূটনীতি তাঁকে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে' তুলেছিল। পুত্রের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ও মমতা ছিল। পুত্র যাতে কোনও প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় সেজন্য সাম্রাজ্যের সকলকেই এবং পুত্রকেও তিনি বুঝতে দিয়েছিলেন যে রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী সেলিমই।

কিন্তু সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া, পারস্পরিক লোভ কুমারকে অবিচলিত থাকতে দিল না। পিতাপুত্রের সস্নেহ সম্পর্ক, অনাবিল আনন্দ ধীরে ধীরে কলুষিত হয়ে উঠল। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সেলিম রাজকীয় ক্ষমতাকে হস্তগত করবার জন্য অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন—সেলিমের এই দুর্ব্যবহার আকবরের মনে গভীর বিতৃষ্ণা ও সন্দেহের সৃষ্টি করল। সেলিমের পরে আকবরের অসন্তোষের আরও একটি কারণ ক্রমশঃই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সেলিম তাঁর পিতৃবন্ধু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আবুল ফজলের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেন।

১৫৫১ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মুবারকের পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হ'তেই আবুল ফজল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সেই তিনি দর্শন বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেন

তাঁর অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি, সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গী, ভাষার দখল তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে পরিগণিত করেছে। তাঁর লেখা 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা,' আকবরের সাম্রাজ্যের ভৌগলিক সীমা, শাসন পদ্ধতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে দু'খানি প্রামাণ্য বই। আকবরের রাজত্বকালের পরে এই বই দু'খানি যথেষ্ট আলোকপাত করে। পিতার নিকট হতে তিনি সত্যপ্রিয়তা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মপ্রবণতা পেয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা সম্রাট আকবরের কর্ণ গোচর হয়। তিনি আবুল ফজলকে রাজদরবারে আহ্বান জানান। তেইশ বৎসর বয়সে আবুল ফজল সম্রাট আকবরের সভায় আসেন ও ক্রমে আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেলিম তাঁর এই পিতৃবন্ধুকে অত্যন্ত অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। সম্মানী প্রিয়বন্ধুর এই অসম্মানে আকবর মনে গভীর দুঃখ পেতেন। সেলিমের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত ও অপমানিত হয়ে আবুল ফজল সেলিমের উদ্ধত অসংযত চরিত্র সম্বন্ধে আকবরের কাছে অনুযোগ জানাতেন। আকবর ক্রমশঃই পুত্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। আবুল ফজলের বন্ধুত্বে আকবর অত্যন্ত আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আকবরের একটি গভীর মানসিক যোগ ছিল। প্রকৃতপক্ষে আবুল ফজল আকবরের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরই সঙ্গে পরামর্শ করে আকবর সাম্রাজ্য শাসন করতেন। সেলিম আবুল ফজলের এই কর্ত্তৃত্বে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আবুল

ফজলের জন্যই তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর প্রকৃত স্থান অর্জ্জন করতে পারছেন না। পিতার অসীম বিশ্বাস ও অনুগ্রহ থেকে আবুল ফজলকে বঞ্চিত করতে না পারায় ক্রমেই তাঁর বিরুদ্ধে সেলিমের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সঞ্চিত হতে লাগল। আবুল ফজলও সেলিমের চরিত্রের সমস্ত দোষ ক্রটীই আকবরের কাছে প্রকাশ করে বলতেন। ক্রমশঃ আকবর সেলিমের চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। পুত্র ও বন্ধুর এই বিবাদ ও মনোমালিন্যে তাঁর অন্তরের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

সেলিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা মুরাদ এই সময়ে একুশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। শাহজাদা মুরাদ সুশিক্ষিত উচ্চাভিলাষী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই অতিরিক্ত সুরাপানে ও অন্যান্য কু অভ্যাসে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। সেলিমের সৌভাগ্য ছিল যে তাঁর সিংহাসনের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী এই রকম অপদার্থ বিলাসী যুবক ছিলেন। অতিরিক্ত সুরাপানের জন্য মুরাদ মারা যান ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে। আকবরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দানিয়েলও মুরাদের চেয়ে কোন অংশে উন্নত ছিলেন না।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনের জন্য আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেলিমকে মেবারের রাণার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আদেশ দেন। সেলিম আজমীরে উপস্থিত হ'য়ে সৈন্যদের রাজপুতনার যুদ্ধে প্রেরণ করেন কিন্তু নিজে শিকার প্রভৃতি আমোদ ও উৎসবে সময় অতিবাহিত

অশ্বপৃষ্ঠে যুবরাজ সেলিম

করিতে থাকেন। আকবরের চরিত্রের প্রভাব হতে দূরে থাকায় সেলিম সহজেই স্বার্থলোভীদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। সহচরেরা তাঁকে সম্রাট ও তাঁর সৈন্যদের সুদূর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিতে থাকেন। ক্ষমতাভিলাষী উদ্ধত সেলিম পিতৃস্নেহের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মানসিংহ খুব সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহের আভাস পেয়েছিলেন এবং শাহজাদাকে এই ব্যর্থ ষড়যন্ত্র থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রয়াস ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বাংলা দেশে আফগান সেনানায়কদের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেওয়ায় মানসিংহ তাঁর রাজপুত সৈন্যসহ বাংলা দেশে যাত্রা করতে বাধ্য হন। সেলিম আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা হবে ভেবে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মানসিংহকে বিদায় দিলেন। মানসিংহ শেষ চেষ্টা হিসাবে সেলিমকে তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে আফগান বিদ্রোহ দমনের জন্য যাত্রা করার অনুরোধ জানান ; কিন্তু সেলিম সে অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। মানসিংহের বাংলা দেশে যাত্রা করার সঙ্গেই সেলিম সসৈন্যে পাঞ্জাব দুর্গ অধিকারের উদ্যোগ করতে লাগলেন। পাঞ্জাব দুর্গের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা কুলিক খাঁ সেলিমকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেও সম্রাটের আদেশ ভিন্ন তাঁকে দুর্গে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃত হন। সেলিমের বন্ধুবর্গ কুলিক খাঁকে বন্দী করে পাঞ্জাব দুর্গ অধিকারে জন্য সেলিমকে পরামর্শ দেন কিন্তু সেলিম সহসা এই কাজ করা

সমীচীন মনে করলেন না। তিনি পাঞ্জাবের ভার কুলিক খাঁর পরেই ন্যস্ত রেখে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হলেন। এই সময়ে সেলিম সংবাদ পান যে তাঁর পিতামহী মরিয়ম মকানি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসছেন। মরিয়ম তাঁর এই পৌত্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেলিম আবাল্য তাঁর কাছেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সেলিমের বিদ্রোহাচরণে রাজ অন্তঃপুরের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং মরিয়ম পৌত্রকে এই অন্যায় কার্য্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু সেলিম পিতামহীর সঙ্গে এই সময়ে সাক্ষাৎ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে পিতামহীর সস্নেহ অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে বিশেষ দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। বৃদ্ধা স্নেহময়ী পিতামহীর অশ্রুজল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। এইজন্য সেলিম পিতামহীর উপস্থিতির পূর্ব্বেই নৌকাযোগে এলাহাবাদে যাত্রা করেন। তাঁর সৈন্যেরা স্থলপথে তাঁকে অনুসরণ করে। বারোদিন জলপথে ভ্রমণের পর সেলিম এলাহাবাদে উপস্থিত হন। এবং এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তিনি আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

খান্দেশের আসির দুর্গে অবস্থান কালে আকবর পুত্রের এই বিদ্রোহাচরণের সংবাদ পান। স্নেহ ও তিরস্কার মিশ্রিত একপত্রে তিনি পুত্রের এই কার্য্যের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। সেই সঙ্গে সেলিমের বাল্যবন্ধু খাজা মহম্মদ সেরিফকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেলিমের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পিতার

আদেশ, বন্ধুর অনুরোধ সবই সেলিমের উদ্ধত মনের কাছে হার মেনে গেল। উপরন্তু সেলিম এই সময় থেকে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে থাকেন।

১৬০১ খৃঃ আকবর আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেলিম এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পথে লুণ্ঠন করতে করতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। শাহজাদা ঘোষণা করলেন যে তাঁর এই যাত্রার উদ্দেশ্য হ'ল আগ্রায় পিতার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। আকবর সেলিমের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন। পুত্রকে তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রেরণ করলেন সমস্ত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করে সামান্য কয়েকজন অনুচর সহ আগ্রায় উপস্থিত হবার জন্য। সৈন্য ছত্রভঙ্গ করতে সেলিম সম্মত হলেন না, তখন আকবর বলে পাঠালেন যে অবিলম্বে সৈন্যসহ সেলিমকে এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে নইলে এর জন্যে ভবিষ্যতে তাঁকে অনুতাপ করতে হবে। এই ভীতি প্রদর্শনে সেলিম বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। যাত্রার পূর্ব্বে পিতার নিকট এক পত্রে তিনি আপনার বিশ্বস্ততার কথা লিখে জানিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইলেন। আকবর সাময়িক ভাবে তাঁর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উড়িষ্যা ও বিহারের শাসন ভার অর্পণ করলেন।

এলাহাবাদে অবস্থানের সময়ে সেলিম আবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টায় যোগদান করেন। তিনি এই সময়ে

'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন, এবং এলাহাবাদে স্বতন্ত্র রাজদরবার স্থাপন করে নিজের নামাঙ্কিত 'ফারমান' অর্থৎ আদেশপত্র দিতে থাকেন।

এই বিপদের সময়ে আকবর আবুল ফজলকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। আবুল ফজল এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেলিম এই সংবাদে বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে আকবরের কাছে আবুল ফজলের উপস্থিতির অর্থ সেলিমের বিরুদ্ধে আকবরের মনে আরও বেশী ক্রোধের সঞ্চার। এই ক্রোধের ফলে আকবর হয়তো বা সেলিমকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। সেলিম সঙ্কল্প করলেন যে আবুল ফজলকে আকবরের কাছে উপস্থিত হবার সুযোগ তিনি দেবেন না। তিনি আবুল ফজলকে হত্যা করার সঙ্কল্প করলেন এবং এই নৃশংস কার্য্যের ভার তিনি দুর্দ্দান্ত বুন্দেলা সর্দ্দার বীরসিংহকে দিলেন!

প্রায় এক শতাব্দী আগে রাজপুতদের একটা শাখা যমুনার দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডে এসে বসবাস করছিল। 'এরা দৈহিক শক্তি কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠুরতায় তাদের চারিপাশে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। ঘন গভীর বনানী, দুরন্ত পাহাড়ী নদী, এবং দুর্গম পাহাড় তাদের মোগল রাজশক্তির হাত থেকে রক্ষা করত বীরসিংহ এই দুর্দ্ধর্ষ জাতির সর্দ্দার। তিনি সেলিমের অনুগ্রহ লাভের আশায় এই কাজে সম্মত হলেন এবং আবুল ফজলের হত্যার আয়োজন করতে লাগলেন।

যথাসময়ে এই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা আবুল ফজলও শুনতে পেলেন। তাঁর হিতৈষী বন্ধুরা তাঁকে অন্যপথে আগ্রায় যাবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু উন্নত ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী আবুল ফজল সামান্য দস্যুদের জন্য নিজের কুর্মপন্থা পরিবর্ত্তন করতে অস্বীকার করলেন। যথাসময়ে আবুল ফজল আগ্রার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল যে বুন্দেলা দস্যুরা কাছেই অপেক্ষা করছে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য। আবুল ফজল এই সংবাদদাতাকে তার সংবাদের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন। কিন্তু বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও যাত্রাপথ পরিবর্ত্তন করলেন না। শুক্রবার দিন প্রভাতে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বুন্দেলা দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ করল। আবুল ফজলের সঙ্গীরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করে আবুল ফজলকে পলায়নের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু নির্ভীক উন্নতচেতা আবুল ফজল ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যা-খ্যান করে বুন্দেলা প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধ ক্রমশঃই ভীষণতর রূপ ধারণ করল। দলে দলে বুন্দেলা রাজপুত এসে আবুল ফজলের মুষ্টিমেয় সৈন্যদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে আবুল ফজলের উদ্ধারের আশা না দেখে তাঁর একজন প্রিয় অনুচর জোর করে আবুল ফজলের অশ্বের রশ্মি ফিরিয়ে তাঁকে নিয়ে পলায়নের উদ্যোগ করল। কিন্তু এই পলায়নের সময়ে জনৈক বুন্দেলা দস্যু তার তীক্ষ্ণ

বর্শার দ্বারা আবুল ফজলের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। আবুল ফজল তাঁর ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পার্ব্বত্য নদী পার হবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। তাঁর আহত দেহ অচৈতন্য হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যায়। আবুল ফজলের প্রিয় ভৃত্য জব্বর খাস তার প্রভুর দেহকে বহন করে একটি গাছের ছায়ার নীচে নিয়ে গিয়ে তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করে। আবুল ফজলের জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু এই সময়ে বুন্দেলা সর্দার বীরসিংহ সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁর ইঙ্গিতে ভৃত্য জব্বর খাস কে নিহত করে আবুল ফজলকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর ছিন্নশির নিয়ে বুন্দেলা সৈন্য বিপুল জয়োল্লাসে ফিরে যায়। এইভাবে ফজলের জীবনের অবসান ঘটে।

আবুল ফজলের ছিন্ন শির এলাহাবাদে সেলিমের কাছে প্রেরণ করা হল। সেলিম তাঁর পরম শত্রুর মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনী'তে তিনি লিখেছেন "যদিও আবুল ফজলের হত্যা সাময়িক ভাবে পিতার মনে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল তবুও এর ফলেই আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলাম এবং পিতার স্নেহকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম।"

আবুল ফজলের হত্যার সংবাদে সমস্ত আগ্রা সহর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সম্রাটের কাছে এ সংবাদ কিভাবে জানানো যায় কেউ ভেবে পেলেন না। অবশেষে আবুল ফজলের

প্রতিনিধি চাঘতাই বংশের রীতি অনুযায়ী আপন হস্তে কৃষ্ণবর্ণের রুমাল বেঁধে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলেন এবং এইভাবে আবুল ফজলের মৃত্যুর কাহিনী সম্রাটকে জানালেন। আকবর এই আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়লেন। প্রিয় বন্ধুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত মন গ্লানি ও অনুশোচনায় ভরে উঠল। এই সময় তিনি বলেছিলেন যে সিংহাসন অভিলাষী পুত্র তাঁর বন্ধুকে হত্যা না করে যদি তাঁকে হত্যা করত তবে তিনি এর চেয়ে অনেক কম বেদনা অনুভব করতেন।

বুন্দেলা সর্দ্দার বীরসিংহের বিরুদ্ধে আকবর দলে দলে মুঘল সৈন্য প্রেরণ করলেন আবুল ফজলের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। বুন্দেলাবাহিনী মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে। তারা ক্রমাগত পর্ব্বত হতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করে মুঘল সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত করে তুলল। বীরসিংহ সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসী সৈন্যদের সাহায্যে পলায়নে সমর্থ হলেন। কিন্তু আকবর তাতে নিরস্ত হলেন না। বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ স্পৃহায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বুন্দেলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন।

কিন্তু এই ভীষণ হত্যাকার্য্যের প্রকৃত অপরাধী সেলিম পিতৃস্নেহ, অন্তঃপুরের প্রভাব এবং রাজ্যের ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলেন। আকবরের সন্তানদের মধ্যে সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিলেন না। সেলিমের পুত্রেরা তখনও অত্যন্ত শিশু। তাদের কাহাকেও সিংহাসনে

স্থাপনের অর্থ ছিল প্রবল গৃহযুদ্ধের সূচনা। এ ছাড়া সেলিম ছিলেন অংঃন্তপুরের বেগমদের অত্যন্ত আদরের সন্তান। সেলিমকে কোনও প্রকার শাস্তি দেওয়ার কথা তাঁরা চিন্তা করতেও পারতেন না! সুতরাং সেলিম আকবরের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেলেন। কিন্তু পিতাপুত্রের মধ্যে কি ভাবে মিলন ঘটানো সম্ভবপর হ'তে পারে তার উপায় কেউ ভেবে পেলেন না। অবশেষে সেলিম জননী সুলতানা সেলিমা বেগম এক উপায় স্থির করেন। সেলিমা বেগম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদূষী রমণী ছিলেন। তাঁর সুন্দর ও মহৎ হৃদয়ের জন্য তিনি প্রজাদের দ্বারা 'খাদিজা' আখ্যায় ভূষিতা হয়েছিলেন পুত্রের দুর্ব্যবহারে ব্যথিতা হ'য়ে তিনি স্বয়ং এলাহাবাদে পুত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেলিমের চরিত্র উদ্ধত ও ক্ষমতাভিলাষী হলেও জননীকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। জননীর উপস্থিতির সংবাদে সেলিম তাঁকে স্বয়ং এসে অভ্যর্থনা করে এলাহাবাদ দুর্গে নিয়ে যান। সেখানে দীর্ঘকাল ধরে সেলিমা বেগম পুত্রকে স্নেহ ও তিরস্কার মিশ্রিত উপদেশ দিয়ে তাঁর অন্যায় কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ মায়ের উপদেশে সেলিম তাঁর অপরাধ বুঝতে পারেন এবং কর্ত্তব্য ও বিশ্বাসের পথে ফিরবার জন্য শপথ করেন। সেলিমা বেগম তখন পুত্রকে সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য উপদেশ দেন। সেলিম তাঁর কথায় স্বীকৃত হন, এবং এলাহাবাদ ত্যাগ করে আগ্রায় যাত্রা করার উদ্যোগ করেন। সেলিমের বন্ধুরা তাঁকে এই কার্য্য থেকে নিবৃত্ত

করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু মহিয়সী জননীর উপদেশে সেলিম তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে জননীর সঙ্গে আগ্রা যাত্রা করেন। আগ্রার অন্তঃপুরে স্নেহময়ী পিতামহীর সঙ্গে দুরন্ত পৌত্রের সাক্ষাৎ অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। এর পরে মরিয়ম মকানি সম্রাটের সঙ্গে সেলিমের মিলন ঘটাবার জন্য আকবরকে তাঁর মহলে আহ্বান করেন। আকবর জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করার পরে বৃদ্ধা মরিয়ম মকানি তাঁর পৌত্রকে নিয়ে আসেন। অনুতপ্ত পুত্র পিতার চরণে পড়ে তাঁর ক্ষমাভিক্ষা করেন। পুত্রস্নেহকাতর আকবর পুত্রকে মার্জ্জনা না করে পারলেন না। তিনি পুত্রকে আপন বক্ষে টেনে নিলেন। পিতাপুত্রের দীর্ঘদিনের বিরোধ অশ্রুজলে অবসান হল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিতাপুত্রের বিরোধের অবসানে আকবর সেলিমকে পুনরায় মেবার অভিযানের উদ্যোগের অদেশ দিলেন। সেলিম ফতেপুর সিক্রী পর্য্যন্ত অগ্রসর হলেন বটে কিন্তু মেবার অভিযানের জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সেনানায়কের পক্ষে যে সব গুণ আবশ্যক তার কোনটিই সেলিমের বিশেষ ছিল না। দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত জাতি ও পার্ব্বত্য ভীলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কৌশল তিনি জানতেন না। মেবার অভিযানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন সুতরাং জনসাধারণের চোখে এই ভাবে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তিনি চাইলেন না। দীর্ঘদিন কর্ম্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখাই স্থির করলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এবং ফতেপুর সিক্রী থেকে মেবার অভিযানের আয়োজনের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে সম্রাটের কাছে ক্রমাগতই অভিযোগ পাঠাতে লাগলেন। অর্থ, সৈন্য, রসদ প্রভৃতি সরবরাহ সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশের পর তিনি আকবরের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে সম্রাটের অনুমতি পেলে তিনি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে অভিযানের জন্য ইচ্ছামত রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ করতে পারেন। আকবর তাঁকে

এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের অদেশ দিলেন। সেলিম ফিরে গেলেন। ১৬০৩ খৃঃ আবার স্বাধীনভাবে রাজদরবার সেখানে স্থাপিত হল।

সম্রাট্ আকবরের স্বাস্থ্য ও মন কিছু দিন থেকেই ভেঙে পড়ছিল। সুদীর্ঘ দিবসের অপরিসীম পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও সংগ্রাম তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতির কারণ হয়েছিল। জীবনের প্রারম্ভে যাদের সঙ্গে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁদের সাহচর্য্যে সুদীর্ঘ কাল সাম্রাজ্যকে সুচারু-রূপে শাসন করে এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় তিনি কত সুদীর্ঘ রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত করেছেন, আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে দেখলেন তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনের পরপারে চলে গেছেন—পুরাতন দিনের আনন্দ ও গৌরবময় স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেবার মত কেউ নেই। রাজা বীরবল, তোডরমল, ভগবান দাস, আবুল ফজল, ফৈজী এঁরা ছিলেন আকবরের চিরদিনের কর্ম্ম সহচর। তাই এঁদের অভাব আকবর অনুভব করছিলেন প্রতিপদে। সবচেয়ে বড় আঘাত তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করছিলেন তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র সেলিমের উদ্ধত দুর্ব্যবহারে। রাজকুমার মুরাদ অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন। দানিয়েল দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। পুত্রদের কথা চিন্তা করে তাঁর সমস্ত অন্তর গভীর নৈরাশ্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠত। মনের এই ক্লেশ তাঁকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে দিল। কিন্তু এদিকে তাঁর জীবনের

অবসানের সম্ভাবনাতেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন তীব্র-ভাবে দেখা দিল।

সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে প্রথম থেকেই কাহারও কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেলিমের ব্যবহারে সকলেই তার পরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রা, বিলাসিতা, পিতৃস্নেহের প্রতি অমর্য্যাদা, আবুল ফজলকে নিহত করা প্রভৃতি ব্যাপারে সেলিমের চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছিল। আকবর যে সাম্রাজ্যকে গৌরবের চরম শিখরে উন্নীত করেছিলেন তাকে সুন্দর ভাবে শাসন করার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন দৃঢ়চিত্ত সুকৌশলী শাসকের যাঁর শাসনে সাম্রাজ্যের উন্নতির গতি ব্যাহত হবেনা। সেলিম রাজ্যের সকলের সেই আশাকে ব্যর্থ করেছিলেন। তাই সেলিমের চেয়ে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। এই সময়ে সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুর বয়স ছিল সতেরো বৎসর। খসরু ছিলেন মানসিংহের ভাগিনেয় ও আকবরের ধাত্রীমাতার পুত্র মিরজা আজিজ কোকার জামাতা। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সেই খসরু ছিলেন সকলের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। দেহকান্তি তাঁর সুন্দর ছিল, চরিত্র ছিল অম্লান, স্বভাব ছিল সহজ ও সরল। শিক্ষা তাঁর সেই সুন্দর চরিত্রকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। যুদ্ধবিদ্যায় ছিল তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি তাঁর পিতা ও খুল্লতাতদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। খসরুর চরিত্রে

সম্ভবতঃ তাঁর পিতামহের মহৎ চরিত্রের ছায়া পড়েছিল। আগ্রার রাজনৈতিক আবহাওয়ার মাঝে বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে খসরুর মনে সিংহাসনের আশা দেখা দিল। মানসিংহ ও মিরজা আজিজের সঙ্গে খসরু ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। রাজন্যের অনেকেই সিংহাসনে খসরুকে স্থাপিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এইভাবে সেলিম ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাঝে এক বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। পিতাপুত্রের সহজ সুন্দর সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে উভয়ে উভয়ের প্রধানতম শত্রু হ'য়ে দাঁড়ান। সেলিমের বিরুদ্ধে খসরুর এই বিদ্রোহাচরণে খসরু জননী শা বেগম অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। তিনি পুত্রকে দীর্ঘ পত্র লিখে তাকে এই অন্যায় কার্য্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু খসরু জননীর সে উপদেশে কর্ণপাত করেন না। সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের স্বপ্নদর্শী বালক বন্ধুদের প্ররোচনায় তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলবার চেষ্টায় তখন আত্মনিয়োগ করেছেন। দিনে দিনে পিতাপুত্রের বিরোধ চরমে উঠল। পুত্রের এই অবাধ্যতা স্নেহময়ী জননীর প্রাণে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করল। এই গ্লানিকে এড়াবার জন্য তিনি আত্মহত্যা করলেন। এই সময়ে সেলিম শিকারে গিয়েছিলেন। বেগমের আত্মহত্যার সংবাদে তিনি দ্রুত প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু তার পূর্ব্বেই শা বেগমের মৃত্যু ঘটে। এই শোচনীয় ঘটনায় সেলিম অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং দীর্ঘকাল কোনও প্রকার আনন্দ উৎসবে যোগদান করেন না। আকবর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এই সময়ে এক

দীর্ঘ ও সস্নেহ পত্র লেখেন। খসরুবাগে শা বেগমের সমাধি দেওয়া হয়।

১৬০৪ খৃঃ দানিয়েলের মৃত্যুতে সেলিমের অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীরও অবসান ঘটল। কিন্তু তথাপি সেলিম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হলেন না। স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারীরূপে এলাহাবাদে তিনি ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। অবশেষে আকবরের ধৈর্য্য শেষ সীমায় পৌঁছল, সকল বাধা অগ্রাহ্য করে পুত্রকে আগ্রায় ফিরিয়ে আনতে তিনি মনস্থ করলেন। সেলিমকে এলাহাবাদ থেকে আগ্রায় আনবার জন্য তিনি স্বয়ং সসৈন্যে এলাহাবাদে যাত্রা করলেন। কিন্তু এবারও সেলিমের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল। যাত্রার মধ্য পথে আকবর সংবাদ পেলেন যে রাজমাতা মরিয়ম মকানি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। আকবর এই সংবাদে দ্রুত আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। মরিয়ম মকানির তখন শেষ অবস্থা। আকবর আগ্রায় পৌঁছিবার অল্প পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যুতে আকবর গভীর দুঃখ পেলেন। এলাহাবাদের উদ্দেশে যে অভিযানের আয়োজন তিনি করেছিলেন ভগ্নহৃদয়ে সে অভিযান তিনি পরিত্যাগ করেন। মরিয়মের মৃত্যুতে সেলিমও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। পিতামহীর কাছে তিনি যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত তাঁরই সাহায্যে বহু বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। মরিয়মের মৃত্যু, রাজধানীতে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার জন্য মিরজা আজিজ ও মানসিংহের ষড়যন্ত্র—এইসব ব্যাপারের জন্য

তিনি আগ্রায় নিজের উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভব করলেন। ১৬০৪ খৃঃ শোকাচ্ছন্ন পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সেলিম আগ্রায় এলেন। আকবর রাজদরবারে তাঁকে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু দরবার ভঙ্গের পর তাঁকে তাঁর বিদ্রোহাচরণের জন্য বিশেষভাবে তিরস্কার করেন এবং দশদিনের জন্য তাঁকে একটী গৃহে আবদ্ধ রেখে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করান। এইভাবে উদ্ধত পুত্রকে শাসনের ব্যবস্থা করলেও অন্তঃপুরচারিণীদের মমতা ও স্নেহের জন্য আকবর সেলিমকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

ক্রমাগত মানসিক বিপর্য্যয়ে ও শারীরিক অসুস্থতায় আকবর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। অবিলম্বে উত্তরাধিকারীত্বের প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। সেলিম ও খসরুর পরস্পরের সম্বন্ধ এই সময়ে চরম পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আকবর পুত্র ও পৌত্রের এই বিরোধে ক্ষতবিক্ষত চিত্তে শয্যা আশ্রয় করলেন। ক্রমে তাঁর দুর্ব্বল দেহ জ্বর ও উদরাময়ে আক্রান্ত হ'ল এবং অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। এদিকে সম্রাটের শেষ শয্যাকে ঘিরে তখন ষড়যন্ত্র ও বিরোধের ঘূর্ণিবাত্যা উঠেছে। মিরজা আজিজ এই সময়ে আকবরের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন। খসরুকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য তিনি আয়োজন করতে লাগলেন। মিরজা আজিজ তাঁর দলস্থ লোকেদের দ্বারা প্রাসাদ পরিপূর্ণ

করে ফেললেন। ষড়যন্ত্রে স্থির হ'ল যে সেলিম অসুস্থ পিতাকে দেখবার জন্য প্রাসাদে পদার্পণ করলেই তাঁকে বন্দী করা হবে। সেলিম এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তিনি প্রাসাদে আসা বন্ধ করলেন। এইভাবে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় মিরজা আজিজ ও মানসিংহ প্রকাশ্যে খসরুকে সিংহাসনে স্থাপনের উদ্যোগ করলেন। এই উদ্দেশ্যে দরবারের প্রধানদের এক সম্মেলন আহুত হল। প্রধানেরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে গেলেন। একদল খসরুকে সিংহাসনে বসাবার পক্ষপাতী, তাঁরা বল্লেন দুর্ব্বলচিত্ত, সুরাপায়ী সেলিমকে সিংহাসন দেবার কোনই সার্থকতা নেই। অপর দল কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন না। চাঘতাই বংশের রীতি অনুযায়ী রাজবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সিংহাসনে বসাবার পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন। মানসিংহ তখন খসরুকে সিংহাসন দেবার জন্য সম্রাটের সম্মতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এইভাবে এক অশান্তিময় গৃহযুদ্ধের সূচনা করে পৌত্রকে সিংহাসন দিতে আকবর চাইলেন না। সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল, মানসিংহ তখন সুলতান খসরুকে নিয়ে বাংলায় ফিরে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সংবাদে আশ্বস্ত হ'য়ে সেলিম অবশেষে তাঁর পিতার শেষ শয্যার পাশে এসে উপস্থিত হ'লেন। সম্রাটের অন্তিম মুহূর্ত্ত তখন আসন্ন। সেলিম এসে তাঁর পায়ের নীচে জানু পেতে বসলেন। সম্রাটের চেতনা ফিরল। তাঁর ইঙ্গিতে সম্রাটের উষ্ণীষ সেলিমের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হ'ল।

সম্রাটের রাজকীয় পরিচ্ছদে তিনি ভূষিত হলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বহু উত্থান ও পতনের—সুদিন ও দুর্দ্দিনের—বিজয় গৌরবের সাক্ষী আকবরের তরবারি বেঁধে দেওয়া হ'ল সেলিমের কটিদেশে। এইভাবে তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হ'লে আকবর ভাবী সম্রাটকে মাথা ঈষৎ আন্দোলিত করে অভিবাদন জানালেন। তারপর চিরদিনের মত এই কর্ম্মবীর নিদ্রিত হ'লেন।

পরদিন যথোচিত সমারোহের সঙ্গে আকবরের দেহ আগ্রা থেকে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী সিকান্দ্রায় নিয়ে যাওয়া হল। সেলিম নিজের স্কন্ধে সেই শবাধার বহন করেছিলেন। আকবর জীবিত কালে তাঁর নিজের জন্য সে সমাধি নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করে-ছিলেন সেইখানেই তাঁর দেহকে সমাধিস্থ করা হয়। সেলিম প্রচুর অর্থব্যয়ে সেই সমাধি নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। ১৬১৩খৃঃ তিন হাজারেরও বেশী শিল্পী ও শ্রমিক এর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৬০৪ খৃঃ ২৪শে অক্টোবর ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে সেলিম সিংহাসন আরোহণ করেন। অভিষেকের সময়ে তিনি আপন হস্তে মুকুট মাথায় দিলেন এবং নাম নিলেন নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশা গাজী। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল বর্ণ, আয়ত চক্ষু ও বঙ্কিম ভ্রূ ছিল তাঁর, মুখমণ্ডল ছিল সর্ব্বদা প্রসন্ন। তিনি আনন্দ উৎসব সমারোহ খুব ভাল বাসতেন।

জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন তিনি। সুখাদ্য ও জমকালো পরিচ্ছদ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে বিপরীত দুইটি ভাবের সাহায্যে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। অতি সামান্য কারণেই তিনি নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ দেখাতেন। আবার অপরদিকে সুবিচার ও সৎ আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। শীতের রাত্রে রাজহস্তীদের স্নানের সময়ে তাদের ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করাবার আদেশ দিয়েছিলেন, অথচ আবুল ফজলের মত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পিতৃবন্ধুকে তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে হত্যা করিয়েছিলেন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে কোথাও তার জন্য এতটুকু অনুতাপের চিহ্ন পাওয়া যায় না, বরং স্পষ্টভাষায় তাঁর এই কাজকে তিনি সমর্থনই করে গেছেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের চরিত্রের সবচেয়ে বড় কথা যে তিনি প্রকৃতিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য, তার ফুল, লতা, পাখী, তার পাহাড়, নদী, ঝরণা তাঁর চোখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। জাহাঙ্গীর নিজে উদ্যান রচনা করতে ভালবাসতেন। আগ্রায় তাঁর রচিত উদ্যান নানা দুষ্প্রাপ্য ফল ও ফুলে সমৃদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষের ফুল তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। পলাশ, বকুল, চাঁপা, কেতকী তিনি বেশী ভাল বাসতেন আর ফলের মধ্যে ভালবাসতেন আম। তিনি বলতেন "মধ্য এশিয়া অথবা আফগানিস্থানের কোনও ফলের সঙ্গে হিন্দুস্থানের আমের তুলনা হয় না"। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে আকবর তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নানারকম ফলের আমদানী করেছিলেন এদেশে। তাদের মধ্যে 'কিসমিস' 'সাহেবি' প্রভৃতি কয়েক রকমের আঙ্গুরও ছিল। জাহাঙ্গীর তরমুজ ও খুব ভালবাসতেন, সুদূর খোরাসান থেকে তাঁর জন্য তরমুজ আসত।

জাহাঙ্গীর তাঁর পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুব তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখতেন। তিনি নিজের জন্য অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ তৈরী করিয়েছিলেন। পোষাকে যথেষ্ট পরিমাণে মণি মুক্তা খচিত না থাকলে সে পোষাক তাঁর পছন্দ হ'তনা। মাথায় তিনি যে উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন তাতে চুনি, হীরা ও পান্না বসানো থাকত। খুব বড় আকারের মুক্তার মালা, চুনি

ও পান্নার হার থাকত তাঁর গলায়। বাহুতে থাকত মূল্যবান হীরক অলঙ্কার। মণিবন্ধে থাকত রত্নবলয়। আঙ্গুলে থাকত রত্ন অঙ্গুরী, পায়ের জুতা ছিল মুক্তাখচিত। তরবারির হাতল এবং তার চর্ম্মাবরণ থাকত হীরক খচিত। কোমরবন্ধনী ছিল সোনার তৈরী। জাহাঙ্গীরের এই পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বর্ণনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি কি রকম আড়ম্বরপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। এই রকম জাঁকজমক ও বিলাসিতার মধ্যেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"আমার সিংহাসন আরোহণের পরে আমি প্রথমেই আদেশ দিলাম আমার সাম্রাজ্যে 'ন্যায়-শৃঙ্খল' বাঁধবার জন্য। এই ন্যায় শৃঙ্খল বাঁধবার উদ্দেশ্য ছিল যেন প্রজাদের সকলেই ন্যায় বিচার পায়। কোনও প্রজার পরে সুবিচারের অভাব হ'লে সে এই শৃঙ্খলটি আন্দোলিত করে প্রধান বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং নিজের অভিযোগ জানাত। ত্রিশ গজ দীর্ঘ এই স্বর্ণশৃঙ্খলে ষাটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধা থাকত, এর ওজন ছিল প্রায় চার মণ। শৃঙ্খলের একদিক বাঁধা ছিল আগ্রা দুর্গের প্রাকারের সঙ্গে এবং অপর দিক বাঁধা ছিল যমুনা নদীর তীরে একটি লৌহ স্তম্ভের সঙ্গে।" কেহ কেহ বলেন এই ন্যায় শৃঙ্খল বাঁধবার প্রথাটি জাহাঙ্গীর পারস্য দেশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণের পর বারোটি আদেশ দেন তাঁর রাজ্যে। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল—

জাহাঙ্গীর পথে পথে ক্লান্ত পথিকদের জন্য সরাই ও মসজিদ স্থাপনের আদেশ দেন।

রাজ্যে কোনও প্রকার উত্তেজক মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়।

কোন অপরাধের জন্যই অঙ্গচ্ছেদ ক'রে শাস্তি দেওয়ার প্রথা রহিত করা হয়।

জমিদার কিংবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পক্ষে অধীনস্থ রায়তদের জমি বিনা কারণে আত্মসাৎ করা দণ্ডনীয় ব'লে গণ্য করা হয়।

বড় বড় সহরে চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পীড়িতের সেবার ভার গ্রহণ করেন। এই সব চিকিৎসার ব্যয়ভার রাজসরকার থেকে বহন করা হ'ত।

উত্তরাধিকারীহীন কাহারও মৃত্যু হ'লে তার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

সম্রাটের জন্মদিন ও তাঁর অভিষেকের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও আকবরের জন্মদিন অর্থাৎ রবিবার পশুবধ নিষিদ্ধ করা হয়।

এইসব আদেশ যাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় তার জন্য জাহাঙ্গীর উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অভিষেকের পরে সম্রাটের নামাঙ্কিত নানা প্রকারের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন হয়। এই সকল মুদ্রার পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কবিতা লেখা থাকত। জাহাঙ্গীরের নামাঙ্কিত কতকগুলি মোহরের পরে লেখা পাওয়া যায়—

"অদৃষ্ট দেবতার লেখনী আলোর অক্ষরে এই মুদ্রার পরে শাহ্ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের নাম লিখেছে।"

অভিষেক উৎসব উপলক্ষ্যে জাহাঙ্গীর সর্ব্বপ্রথমেই বন্দীদের মুক্তি দান করেন। রাজদরবারের প্রত্যেক লোকই এই সময়ে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। আকবরের সময়ের সমস্ত বিশিষ্ট লোকদেরই জাহাঙ্গীর সম্মান অর্থ ও পদগৌরবে ভূষিত করেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময়ে যে সব ওম্‌রাহরা আকবরের পক্ষে থেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর তাঁদের সকলেই ক্ষমা করেন ও সম্মানজনক পদে উন্নীত করেন।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের পরে মানসিংহ খসরুকে নিয়ে বঙ্গদেশে যাত্রা করার উদ্যোগ করছিলেন। জাহাঙ্গীর মানসিংহের সঙ্গে খসরুকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল সুদূর বঙ্গদেশে খসরু মান-সিংহের সহায়তায় হয়তো বা সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন। সেইজন্য মানসিংহকে একাকী বঙ্গদেশে যাত্রা করার আদেশ দিয়ে খস্‌রুকে তিনি রাজপ্রাসাদে আহ্বান করলেন। মানসিংহ শাহজাদার জীবন সম্বন্ধে সম্রাটের কাছে প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করলেন। জাহাঙ্গীর খস্‌রুর জীবনের নিরাপত্তার সম্বন্ধে শপথ করলে মানসিংহ বঙ্গদেশে যাত্রা করলেন। খস্‌রু আগ্রার একটি পুরাতন প্রাসাদ সংস্কার করিয়ে

সেই প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে পিতাপুত্রের মিলন ঘটলেও অন্তরে অন্তরে তাঁরা পরস্পরের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা পোষণ করতে লাগলেন। শাহজাদা খসরু এতদিন ধরে সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের যে স্বপ্ন দেখছিলেন অতি সামান্যের জন্য তা' থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মনে মনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। পিতার অধীনে এইভাবে বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করছিলেন। অন্যদিকে জাহাঙ্গীর পুত্রের সাম্প্রতিক বিদ্রোহাচরণে তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং পুত্রকে প্রায় বন্দী অবস্থায় রেখেছিলেন যাতে শাহজাদা আবার বিদ্রোহের সুযোগ না পান। সমস্ত জীবনব্যাপী এই কারারুদ্ধ অবস্থার কথা চিন্তা করে উচ্চাভিলাষী রাজকুমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কারাগারের বাইরে এখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে অগণিত অনুরক্ত প্রজা, এখনও দেহে তাঁর শক্তি, বীর্য্য ও সাহস আছে যার সাহায্যে হয়তো বা তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে—অন্ততঃ স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ তিনি করতে পারেন। প্রাসাদের বাইরে কয়েকশত উৎসাহী যুবক খস্রুর মুক্তি কামনায় সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লেন। অবশেষে তাঁদের সাহায্যে খস্রু তাঁর বন্দী নিবাস থেকে পলায়ন করলেন। শনিবার দিন গভীর রাত্রে পিতামহের সমাধি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন তিনি। রবিবার আকবরের জন্মদিবস। সুতরাং শাহজাদার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা

ছিল না। রাত্রের অন্ধকারে খস্‌রু রাজপ্রাসাদের বাইরে এলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য সাড়ে তিনশত অশ্বারোহী যুবক। তাদের সঙ্গে খস্‌রু দ্রুত পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হলেন।

খস্‌রুর প্রাসাদ থেকে পলায়নের সংবাদ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ পেয়ে গেল। শেষরাত্রে একজন মশালধারী প্রহরী শাহজাদার কক্ষ শূন্য দেখে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ জানায়। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজার প্রাসাদে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। সম্রাট তখন নিদ্রিত ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ খস্‌রুকে বন্দী করার জন্য সেখ ফরিদকে প্রেরণ করেন। সম্রাট নিজেও সসৈন্যে যাত্রা করেন পরদিন প্রভাতে। অনেকেই মনে করেছিলেন যে খস্‌রু বঙ্গদেশে গিয়ে মানসিংহের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে তিনি পঞ্জাবের পথে অগ্রসর হয়েছেন। দ্রুত ও সতর্ক ভাবে তাঁকে অনুসরণ করা হল।

এদিকে খস্‌রু পঞ্জাবের পথে হুসেন বেগ ও তাঁর তিনশত বীর সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হ'লেন। শত শত বিদ্রোহী কৃষক খস্‌রুর এই অভিযানে যোগদান করল। ক্রমে খস্‌রুর সৈন্য সংখ্যা বারো হাজার হল। কিন্তু খস্‌রু তাঁর এই বিরাট সৈন্য বাহিনীর পরে আপন কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন না। উন্মত্ত, অশিক্ষিত কৃষকদল খস্‌রুর নিষেধ সত্ত্বেও গ্রামবাসীর পরে নৃশংস অত্যাচার করত—লুণ্ঠন করত তাদের খাদ্য সম্ভার।

সমস্ত দিন এই ভাবে চলার পর রাত্রে উন্মুক্ত প্রান্তরে খসরু রাত্রি যাপন করতেন। ক্রমে খস্রুর অর্থ ফুরিয়ে এল— সৈন্যদের খাদ্যসম্ভার যোগানো তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল শিখগুরু অর্জ্জুনের। শিখগুরু তখন কাবুল থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন। শিখ কাহিনীতে পাওয়া যায় যে অর্জ্জুন সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক গুরুপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। খসরু তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। গুরু অর্জ্জুন তাঁকে জানালেন যে রাজকুমারকে সাহায্য করার মত প্রচুর অর্থ নেই তাঁর কাছে। তাঁর যা আছে তা' কেবলমাত্র দরিদ্রদেরই দেওয়া যেতে পারে। সাশ্রুনেত্রে কুমার খস্রু তাঁকে বল্লেন যে রাজকুমারের পদমর্য্যাদা ও অর্থসম্পদ কিছুই তার নেই, তিনি অতি দরিদ্র প্রার্থী। পথচলার পাথেয় পর্য্যন্ত তাঁর নেই। অর্জ্জুন এই কথার পরে খস্রুকে পাঁচ হাজার টাকা দেন। জাহাঙ্গীর বলেছেন যে "অর্জ্জুন খস্রুর ললাটে এই সময়ে রাজটীকা অঙ্কিত করে' দিয়েছিলেন।" অর্জ্জুনের কাছে অর্থ সাহায্য পেয়ে খসরু লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রেরিত দিলওয়ার খাঁ খস্রুর দুইদিন আগে লাহোর দুর্গে উপস্থিত হন এবং দুর্গে প্রবেশ পথ রুদ্ধ করেন। খস্রুর সৈন্যবাহিনী দুর্গের সৈন্যসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী থাকলেও তারা অশিক্ষিত এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিল। যুদ্ধ কৌশল তারা বিশেষ কিছুই জানত না। অন্যদিকে দুর্গের সৈন্যরা সুশিক্ষিত—যুদ্ধে নিপুণ। খসরু

দুর্গ অবরোধ করে' বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সেখ ফরিদের নেতৃত্বে মোগল সৈন্যবাহিনী লাহোরের নিকটবর্ত্তী সুলতানপুরে এসে পৌঁছল। দুইদিক থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায়—লাহোর দুর্গের কাছে কিছু সৈন্য রেখে খসরু স্বয়ং সেখ ফরিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যাত্রা করলেন। জাহাঙ্গীর পুত্রের সঙ্গে একবার শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। ভৈরোয়ালের যুদ্ধে খসরুর অদৃষ্ট নির্ণীত হল। খসরুর সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। খসরু আবদর রহিম হুসেন বেগ এবং অন্যান্য প্রধান সেনানায়কদের সঙ্গে পলায়ন করেন। হুসেন বেগ খসরুকে কাবুলে যাবার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দেন। হুসেন বেগ খসরুকে এই বলে উৎসাহিত করেন যে বাবর, হুমায়ূন এবং অন্যান্য অভিযানকারীরা যাঁরা ভারতবর্ষ অভিযানে সাফল্যলাভ করেছিলেন তাঁরা সবাই কাবুল থেকে তাঁদের জয়যাত্রা সুরু করেছিলেন। খসরুর রাজপুত সৈন্য ও আফগান সৈন্যরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হ'ল না। তথাপি খসরু হুসেন বেগ ও অপর সামান্য কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে কাবুল যাত্রা করলেন। অবিশ্রান্ত ভাবে পথ চলার পরে গভীর রাত্রে তাঁরা কাবুলের পথে চেনাব নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সম্রাটের আদেশে তখন রাত্রে নদী পারাপার নিষিদ্ধ। নদীর তীরে দেখা গেল মাত্র দুইখানি নৌকা। মাঝিরা কোনও প্রলোভনেই বা ভীতি প্রদর্শনেও কুমার খসরুকে নদী পার করতে সম্মত

হল না। তখন উপায়ান্তর না দেখে হুসেন বেগ বলপ্রয়োগ করে' নৌকায় আরোহণ করেন এবং খসরুকে নিয়ে নিজেই নৌকা চালাতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে খসরুর অনুসরণকারী রাজকীয় সৈন্যদল নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। হুসেন বেগ অনেক চেষ্টা করেও কুমারকে নদীর অপর দিকে নিয়ে যেতে পারলেন না। সৈন্যদল খসরুকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে প্রেরণ করল। জাহাঙ্গীর এই সময়ে লাহোরে অবস্থান করছিলেন! তিনি এই বিজয় সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বন্দীদের অবিলম্বে তাঁর কাছে উপস্থিত করার আদেশ দেন। রাজকুমারের সঙ্গীদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। হুসেন বেগকে চর্ম্মমশকে বন্ধ করে হত্যা করা হয়। খসরুর সাহায্যকারীদের লাহোর রাজপথে কাঠের মঞ্চের পরে বন্দী অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং কুমার খসরুকে হস্তীর পরে নিয়ে সমস্ত শহর ভ্রমন করানো হয় তাঁর অনুচরদের দুর্দ্দশা দেখবার জন্য।

এর পরে জাহাঙ্গীর শিখগুরু অর্জ্জুনের পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে সাহায্য করার জন্য। গুরু অর্জ্জুনকে বন্দী করে' হত্যার আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই সময় পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার অধিকারের উদ্যোগের সংবাদ লাহোরে আসে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর কাবুল

বিজয়ের পর ১৫২২ খৃঃ কান্দাহার অধিকার করেন। ১৫৩০ খৃঃ কান্দাহার বাবরের দ্বিতীয় পুত্র কামরাণের দ্বারা শাসিত হয়। এই সময়ে শেরশাহের কাছে পরাজিত হুমায়ুন পারস্যের রাজ দরবারে বাস করছিলেন। পারস্য রাজের সহায়তায় অতি সহজেই তিনি কান্দাহার অধিকার করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর কান্দাহার পারস্যের অধিকারভুক্ত হয়। এর কিছু পরে আকবর আবার কান্দাহার জয় করেন। এইভাবে সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ধরেই কান্দাহারে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্য সম্রাট কান্দাহার অধিকারের সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। আকবরের মৃত্যু ও শাহজাদা খসরুর বিদ্রোহ তাঁর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগের সৃষ্টি করে।

পারস্যের সিংহাসনে তখন শাহ্ আব্বাস। ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ও সাহসী রাজা ছিলেন। ১৬০৬খৃঃ শাহ্ আব্বাস কান্দাহার অবরোধের উদ্যোগ করেন। কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শাহ বেগ খান পূর্ব্বেই এই বিপদের আভাস পেয়েছিলেন এবং অবরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। লাহোরে তিনি সৈন্য সাহায্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ পাঠান। ১৬০৭ খৃঃ মোগল সাহায্য বাহিনী কান্দাহারের উপকণ্ঠে পৌঁছে। এই বিপুল বাহিনীর উপস্থিতিতে পরাজয়ের আশঙ্কায় পারস্যরাজ কান্দাহারের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন এবং পারস্য সৈন্য দ্রুত পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইভাবে কান্দাহার অভিযান

ব্যর্থ হওয়ায় পারস্য সম্রাট এক নূতন কৌশল অবলম্বন করেন। জাহাঙ্গীরের কাছে তিনি রাজদূত প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীরকে সেই সঙ্গে এক পত্রে তিনি এই অভিযানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে' জানান যে এ কাজ সম্পূর্ণরূপে তাঁর অজ্ঞাতসারে হয়েছিল, তিনি এর বিষয়ে কিছুই জানতেন না। সুদূর পারস্যের সঙ্গে বিরোধে জাহাঙ্গীর অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি শাহ্‌ আব্বাসের এই কৈফিয়তেই সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কান্দাহারের দুর্গকে সুদৃঢ় করবার জন্য মিরজা গাজীর অধীনে ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য কান্দাহারে নিযুক্ত করেন। ১৬০৭ খৃঃ মার্চ্চ মাসে সাময়িকভাবে কান্দাহার সমস্যার অবসান ঘটে।

জাহাঙ্গীর গ্রীষ্মকাল কাবুলের পর্ব্বত উপত্যকায় অতিবাহিত করবেন স্থির করলেন। ২৭শে মার্চ্চ তিনি লাহোর পরিত্যাগ করে কাবুল যাত্রা করলেন। জুন মাসের ৩রা তারিখে তিনি কাবুল প্রবেশ করলেন। কাবুলের প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে খুব সুন্দর বর্ণনা করে গিয়েছেন। কাবুল প্রাচীনকালে অত্যন্ত মনোরম স্থান ছিল। কাবুলের প্রধান সৌন্দর্য্য ছিল তার পার্ব্বত্য ঝরণা ও নদী পরিবেষ্টিত উদ্যান। জাহাঙ্গীর বলেছেন কাবুলের প্রসিদ্ধ সাতটি উদ্যানে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সাতটি উদ্যানের মধ্যে জাহাঙ্গীরের পিতামহী মরিয়ম মকানির তৈরী একটি উদ্যানও ছিল। কাবুলের স্বচ্ছ ঝরণায় জাহাঙ্গীর মাছ

ধরতেন—অনেক মাছের নাকে পরানো হত স্বচ্ছ সুন্দর মুক্তা, তারপর তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হত জলে। মুক্তাসজ্জিত মাছের খেলা দেখে তিনি ভারী আনন্দ পেতেন। কাবুলে জাহাঙ্গীর যথেষ্ট চেরীফুলের গাছ দেখেছিলেন। চেরী ফুলকে তিনি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চুনির সঙ্গে তুলনা দিয়ে গেছেন। কাবুলের ছবির মত দৃশ্যাবলী, তার ঝরণা, তার নদী, তার পুষ্পোদ্যান জাহাঙ্গীরের কাছে কাবুলকে স্বর্গের মত সৌন্দর্য্যশালী করে তুলেছিল। এই কাবুল ভ্রমণের সময়ে তিনি একদিন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঘটনাটি হল একটি বৃহৎ মাকড়সা ও সাপের লড়াই। লড়াইয়ের শেষে বিজয়ী মাকড়সাটি পরাজিত সাপটিকে ধীরে ধীরে গিলে ফেলে। ঘটনাটি জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি তাঁর চিত্রকরকে দিয়ে এই ঘটনাটি অঙ্কিত করে রেখেছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন "কাবুলে যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পরে বসে বাবর বিশ্রাম ও সুরাপান করতেন সেইখানি আমি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিদর্শন করি। সেই প্রস্তরখানিতে বাবরের নাম খোদিত ছিল—লেখা ছিল "উমর শেখ গুরগণের পুত্র পৃথিবীর আশ্রয়দানকারী রাজা বাবরের বিশ্রাম স্থান"। আমিও আমার অনুচরদের আদেশ দিয়ে সেই প্রস্তরেরই অপরদিকে আমার নাম খোদিত করে রাখলাম।"

১৬০৭ খৃঃ আগষ্ট মাসের শেষভাগে জাহাঙ্গীর লাহোর যাত্রা করেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁকে

মাকড়সা ও সাপের লড়াই

হত্যা করায় এক ঘোরতর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন।

জাহাঙ্গীরের কাবুলে অবস্থানকালে শাহজাদা খসরু আসফ খাঁর প্রহরাধীনে ছিলেন। জাহাঙ্গীর এই সময়ে খসরুর শৃঙ্খল মুক্তির আদেশ দেন এবং খসরু ইচ্ছামত উদ্যানে ভ্রমণ করবার অনুমতি লাভ করেন। আসফ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এই সময়ে শাহজাদার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ক্রমে ক্রমে রাজধানীর এক শ্রেণীর লোকের মনে জাহাঙ্গীরের অনুপস্থিতির সুযোগে খসরুকে সিংহাসনে স্থাপন করার আশা জাগ্রত হয়। প্রায় চারিশত বিশিষ্ট লোক এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। স্থির হয় কাবুলের পথে জাহাঙ্গীরকে হত্যা করা হবে। কিন্তু খসরুর দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে জাহাঙ্গীর অধিকাংশ অপরাধীকেই মুক্তি দেন। কেবলমাত্র চারজন প্রধান অপরাধীকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের প্রধানতম অপরাধী খসরুর সম্বন্ধে কি করা যায় সম্রাটের কাছে সেইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে অনেক পরামর্শের পর শাহজাদা খসরুকে দৃষ্টিহীন করে দেওয়াই তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। সম্রাটের আদেশ অনুসারে প্রজাবৃন্দের প্রিয়তম রাজপুত্র খসরুকে লৌহ শলাকার সাহায্যে অন্ধ করা হ'ল।

এই সময়ে পাটনায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জনৈক মুসলমান যুবক নিজেকে নির্য্যাতিত খসরু বলে পরিচয় দেয়।

রাজকুমারের সঙ্গে সেই যুবকের আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। সে আপন মুক্তির সম্বন্ধে একটি মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে এবং জনসাধারণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা জানায়। জনসাধারণের মনে খসরুর জন্য অনেকখানি সমবেদনা ও করুণা সঞ্চিত ছিল। তারা অন্ধভাবে এই মুসলমান যুবকের প্রতারণায় বিশ্বাস করল। যুবক তাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু সৈন্যসহ পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পাটনার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা তখন পাটনায় অনুপস্থিত ছিলেন। যুবক আকস্মিক ভাবে পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করে। সাতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে পাটনায় তার রাজত্ব চলে। পাটনার শাসনকর্ত্তা ইতিমধ্যে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন ও দ্রুত পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অতি অল্প আয়াসেই পাটনা উদ্ধার করেন। যুবক যুদ্ধে নিহত হয়। এইভাবে পাটনা বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

১৬০৮ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ জাহাঙ্গীর আগ্রায় প্রবেশ করেন। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে খসরু তখন দৃষ্টিহীনভাবে দিন অতিবাহিত করছিলেন। পুত্রস্নেহে কাতর জাহাঙ্গীর পারস্যের চিকিৎসকের সাহায্যে খসরুর একটি চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নাম। প্রায় পনের বছর ধরে এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যকে আপন ইচ্ছামত পরিচালনা ও শাসন করেছিলেন। তাই তাঁর জীবন সকলের কাছে এত রহস্যময় বলে মনে হয়। নূরজাহান সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হল এই :—

পশ্চিম তাতারি গিয়াসবেগ অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ে যখন পত্নীসহ ভারতবর্ষে ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে আসছিলেন, তখন সেই দুরন্ত মরুভূমিতে জন্ম হয় মেহেরউন্নেসার। সহায় সম্বলহীন নিরুপায় পিতা সেই নবজাতা কন্যাকে মরুভূমিতে পরিত্যাগ করে চলে আসেন। কিন্তু অদৃষ্টগুণে সেই দুরন্ত মরুভূমিতে পরিত্যক্ত হয়ে ও কন্যাটির মৃত্যু হল না। মালিক মাসুদ নামে একজন ধনী বণিক তখন ভারতবর্ষে আসছিলেন। মরুভূমি অতিক্রম করার সময়ে এই নবজাতা কন্যাটিকে দেখে তাঁর মন দয়ার্দ্র হয়ে উঠল। তিনি তাকে তুলে নিলেন। পথেই মালিক মাসুদের সঙ্গে দেখা হ'ল গিয়াসবেগ ও তাঁর পত্নীর। কন্যাকে তিনি তার জননীর কাছে দিয়ে দিলেন এবং তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে তাদের আগ্রায় নিয়ে এলেন। এখানে গিয়াসবেগ আকবরের দরবারে কাজ গ্রহণ করেন।

মেহেরউন্নেসা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তাঁর সৌন্দর্য্য ও গুণে মুগ্ধ হয়ে যুবরাজ সেলিম তাঁকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাতে সম্মত না হয়ে পারস্য দেশীয় এক বীর যুবকের সঙ্গে মেহেরউন্নেসার বিবাহ দেন। এই যুবকের নাম শের আফগান। সেলিম সম্রাট হয়ে শের আফগানকে হত্যা করান এবং মেহেরউন্নেসাকে বিবাহ করেন।

সম্প্রতি কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এই কাহিনীটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হ'লেও ঐতিহাসিক সত্য নয়। তাঁরা বলেন মিরজা গিয়াসবেগ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে' পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে আসছিলেন। মালিক মাসুদ নামে জনৈক ধনী ব্যবসায়ী তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। মরুভূমিতে মেহেরের জন্ম হয়। এর পরে দস্যু কর্ত্তৃক তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ায় মালিক মাসুদ তাঁদের দুর্দ্দশায় বিচলিত হন এবং তাঁদের সকলের ভার গ্রহণ করেন। লাহোরে পৌঁছে মালিক মাসুদ, গিয়াস বেগ ও তাঁর দুই পুত্রকে আকবরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আকবর গিয়াসবেগ ও তাঁর পুত্রকে রাজদরবারে কাজ দেন।

মেহেরউন্নেসা সতেরো বৎসর বয়সে পারস্য যুবক আলি কুলী ইস্তাজলুর পত্নী হন। ১৫৯৯ খৃঃ আলি সেলিমের অধীনে সৈন্যদলে নিযুক্ত হন। সেলিম এই সময়ে আকবর কর্ত্তৃক মেবার অধিকারের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। আলি কুলী এক দুর্দ্দান্ত

ব্যাঘ্র হত্যা করে শের আফগান নামে পরিচিত হন। সেলিমের বিদ্রোহের সময়ে তিনি সেলিমের পক্ষ ত্যাগ করে' আকবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সিংহাসন আরোহণেরপরে সেলিম তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একটি জায়গীর তাঁকে প্রদান করেন। বঙ্গদেশ তখন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলরূপে বিবেচিত হত। শের আফগানকেও সেই ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গণ্য করা হল। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কুতুবুদ্দিন আদেশ পেলেন শের আফগানকে আগ্রার রাজদরবারে প্রেরণ করার জন্য। তিনি সসৈন্যে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়ে শের আফগানকে দেখা করার জন্য সংবাদ পাঠালেন। শের আফগান মাত্র দুইজন দেহরক্ষীর সঙ্গে তাঁর শিবিরে পৌঁছবামাত্র কুতুবের ইঙ্গিতে রাজকীয় সৈন্যদল শের আফগানকে বন্দী করার উপক্রম করল। এই অন্যায় অবিচারে শের আফগানের দেহের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি কুতুবুদ্দিনের কাছে এই ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করলেন। কুতুব তাঁর দিকে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত শের তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। কুতুব সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। সেই মুহূর্ত্তেই রাজকীয় সৈন্যদল শেরকে চতুর্দ্দিকে হ'তে আক্রমণ করল। একাকী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শের নিহত হলেন। এই ঘটনার বারো ঘণ্টা পরে কুতুবুদ্দিনও প্রাণত্যাগ করেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুতে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেন। শের আফগানের মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী ও কন্যা আগ্রায় প্রেরিত হন। মেহেরউন্নেসা

আগ্রার অন্তঃপুরে সুলতানা সেলিমা বেগমের প্রধানা পরিচারিকা নিযুক্তা হলেন। ১৬১১ খৃঃ জাহাঙ্গীর তাঁকে বিবাহ করেন।

সাধারণভাবে এই হ'ল মেহেরের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিবাহের ইতিহাস! জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের সময়ে মেহেরউন্নেসার বয়স ছিল চৌত্রিশ বৎসর। সৌন্দর্য্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য জাহাঙ্গীর তাঁকে প্রথমে 'নূর-মহল'-প্রাসাদের আলো ও পরে 'নূর-জাহান'-জগতের আলো এই আখ্যায় ভূষিত করেন। পারস্যের এই সুন্দরী রমণী সকল গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ও খুব ভাল ছিল। হাতের লক্ষ্য ছিল তাঁর অব্যর্থ। জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে একবার শিকারে নূরজাহান নিজের হাতে চারিটি ব্যাঘ্র হত্যা করেছিলেন বন্দুকের সাহায্যে।

মানসিক সৌন্দর্য্য ও শক্তিতেও তিনি অসামান্যা ছিলেন। তাঁর সহজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সংস্কৃতিপূর্ণ মন উচ্চশিক্ষায় আরও সুন্দররূপে গ'ড়ে উঠেছিল। পার্সী-সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর কবিতা জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিল। ১৬১৩ খৃঃ সুলতানা সেলিমা বেগমের মৃত্যুর পরে নূরজাহান অন্তঃপুরের সর্ব্বপ্রধানা বেগমের সম্মান লাভ করেন।

নূরজাহান অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। প্রচলিত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের প্রচলন তিনি করেছিলেন। গৃহসজ্জার নূতন আসবাব তিনি আবিস্কার করেন। নিমন্ত্রণ উৎসবে গৃহ ও ভোজের টেবিল

তিনি সুন্দর রুচিসম্মত ভাবে সজ্জিত করতে পারতেন। শিল্পকার্য্যে তাঁর বিশেষ নিপুণতা ছিল।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরপ্রিয় বেগমের অন্তরে দরিদ্রের প্রতি উদারতার অভাব ছিল না। অসহায় অনাথ বালিকাদের তিনি মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করতেন। তাঁর সম্রাজ্ঞী জীবনের ষোল বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচশত দরিদ্র বালিকার বিবাহ তিনি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ছোট বড় অজস্র দানে তিনি প্রার্থীর অভাব পূরণে সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে অন্তরের সম্পদ ও শক্তিতে ইনি শক্তিময়ী ছিলেন। শুভার্থিনীরূপে তিনি জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র খুরমকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেছিলেন আবার শত্রুহিসাবে তাঁকে সকল সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে' দুর্দ্দশার নিম্নতম স্তরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞীরূপে সমগ্র সাম্রাজ্যের পরে ছিল তাঁর একাধিপত্য—তাঁরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে রাজ্য শাসনকার্য্য। আবার যখন স্বামীর মৃত্যুতে তিনি ক্ষমতাচ্যুতা তখনও বিদ্রোহাচরণ না ক'রে শান্তভাবেই ধর্ম্মজীবন যাপন করেছেন তিনি। এমনই ছিল তাঁব মানসিক দৃঢ়তা। এরই সাহায্যে সে যুগের সকল বাধাকে অতিক্রম করে' পর্দ্দার বাইরে এসে তিনি রাজকার্য্য সম্পাদন করতেন। নিজের চোখে দেখে সব জিনিষ বিচার করতেন।

নূরজাহানের সংস্পর্শে এসে জাহাঙ্গীর শিখলেন আলস্য-পরায়ণতা ও বিলাসিতা। স্বাধীন বুদ্ধিচালনার ক্ষেত্রকে তিনি

সঙ্কুচিত করে' আনলেন। নির্ব্বিকারচিত্তে সাম্রাজ্যের কঠিন দায়িত্বকে তিনি তুলে দিলেন সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দৃঢ় হস্তে। তাঁর নির্ভীক ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান হ'য়ে গেল জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্ব।

রাজ্য শাসন কার্য্যে নূরজাহান তাঁর পিতা গিয়াসবেগ ও ভ্রাতা আসফ খাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তার জননী অসমৎ বেগমও ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী। তিনিই ইতিহাসে আতরের আবিষ্কর্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সে কাহিনীটি ভারী সুন্দর। জাহাঙ্গীর এই ঘটনা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করে' গেছেন। একদিন গোলাপজল প্রস্তুত করার সময়ে অসমৎ বেগম দেখতে পেলেন গোলাপ জলের পরে একটি শ্বেত পদার্থ ভাসমান। ভাসমান পদার্থটির সুগন্ধ গোলাপ জলের চাইতেও মধুর। অসমৎ বেগম সেই পদার্থটি একটি পাত্রে সংগ্রহ করে রাখেন। যখন বেশী গোলাপজল প্রস্তুত হত তখন সেই শ্বেত পদার্থটি বেশী পরিমাণে পাওয়া যেত। অবশেষে অসমৎ বেগম সেই জিনিষটি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দেন। জাহাঙ্গীর এই জিনিষটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি বলেছেন "এর সুবাস এমনই তীব্র যে যদি এর একটি বিন্দু মাত্রও হাতে মাখানো হয় তবে সমস্ত রাজদরবার সদ্য ফোটা গোলাপের সুবাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে"। খুসী হ'য়ে এই জিনিষটির আবিষ্কর্ত্রীকে তিনি একছড়া মূল্যবান মুক্তার মালা

উপহার দেন। সেলিমা বেগম এই নবাবিষ্কৃত জিনিষটির নাম দেন 'আতর-ই-জাহাঙ্গীরি।'

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অসমৎ বেগম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পরে তাঁর প্রভাব ছিল খুব বেশী। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা তাঁর বুদ্ধিপ্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা করে গেছেন।

নূরজাহানের সুযোগ্য ভ্রাতা আসফ খাঁ রাজদরবারে প্রতাপশালী লোক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ থাকলেও তিনি বাস্তববাদী লোক ছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল গভীর। তাঁর দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, পর্য্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে গৌরবের শিখরে উন্নীত করেছিল।

১৬১২ খৃঃ এপ্রিলে আসফ খাঁর কন্যা অর্জ্জুমন্দ বানু বেগমের সঙ্গে কুমার খুরমের বিবাহ হয়। ইনিই পরে মমতাজ বেগম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খুরমের বয়স এই সময়ে ছিল কুড়ি বৎসর। মোগল রাজকুমারদের মত কুমার খুরম সমস্ত শিক্ষাই পেয়েছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে তাঁর ছিল মানসিক শক্তি। তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সুরাপান করেন নি। চব্বিশ বৎসরের জন্মোৎসবে জাহাঙ্গীরের বিশেষ অনুরোধে সামান্য সুরা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে যখন মোগল দরবারে সুরার স্রোত অবিরত প্রবাহিত হত তখনকার রাজকুমারের পক্ষে এটা বড় কম দৃঢ়চিত্তের পরিচায়ক নয়। শাহজাদা খুরম ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর

স্বভাব ছিল অত্যন্ত গম্ভীর ও আত্মসচেতন। ইংরাজ রাজদূত স্যর টমাস রো তাঁর বিবরণীতে শাহজাদাকে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির বলে বর্ণনা করেছেন। বাল্যকাল থেকেই সামরিক যুদ্ধ-কৌশলে তিনি নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। চিরদিনই উচ্চ আশায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল—রাজমুকুটের পরে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অদৃষ্টদেবীও খুরমের পরে প্রসন্নই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত পুত্র হ'লেও কুমার খসরু বিদ্রোহী বলে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে পারভেজ উচ্চাকাঙ্খী হ'লেও অতিরিক্ত বিলাসী ও অপদার্থ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল। জাহান্দ্যর অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। শাহ্রীয়ার ছিলেন অত্যন্ত শিশু। সুতরাং খুরম নিজেকে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। ১৬১২ খৃঃ এপ্রিলে সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে কুমার খুরমের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহে আসফ খাঁ ও কুমারের মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয় কুমারের ভবিষ্যৎ জীবনে তা' খুব সাহায্যপ্রদ হয়েছিল। এই বিবাহে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল। রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সঙ্গে নূরজাহান, আসফ খাঁ ও গিয়াস বেগ বা ইতিমৎউদ্দৌল্লার যোগ সাধন। এর পরের দশ বৎসর এই চারজন ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য শাসন করে ছিলেন—সম্রাটের নামে। নূরজাহানের সাম্রাজ্যশাসন বলতে এঁদের

চারজনকেই বোঝায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা নূরজাহানের শাসনের কথা বর্ণনা করে' গেছেন। ঝরোকার আড়ালে থেকে তিনি রাজকীয় আদেশ দান করতেন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা এই সময় রাজ্যে প্রচলিত হয়। রাজকীয় আদেশপত্রে তাঁর নাম মুদ্রিত হত। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রায় লেখা থাকত—"সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে সম্রাজ্ঞী বেগম নূরজাহানের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার ঔজ্জ্বল্য শতগুণ বর্দ্ধিত হ'ল।"

জাহাঙ্গীর এই সময়ে ধীরে ধীরে বিলাস সাগরে নিমজ্জিত হ'লেন। স্বাস্থ্যও তাঁর এই সময়ে খুব খারাপ হয়ে পড়ে। রাজ্যশাসন কার্য্য থেকে জাহাঙ্গীর সম্পূর্ণভাবে অবসর নিলেন। মোগল রাজঅন্তঃপুর এই সময়ে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল হ'য়ে উঠেছিল। নূরজাহানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকেরা এই সময়ে রাজদরবারের উচ্চ পদগুলিতে নিযুক্ত ছিল। নূরজাহানের এই কার্য্যে পুরাতন ওমরাহদের মধ্যে বিশেষ অপ্রীতির সৃষ্টি হল। এই সব অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মহাবৎ খাঁ প্রধান। নূরজাহানের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করতে তিনি স্বীকৃত হলেন না। বংশ গৌরব ও আত্মসম্মান বিস্মৃত হ'য়ে জাহাঙ্গীরের পক্ষে এইভাবে রাজকার্য্য অবহেলা করাকে মহবৎ খাঁ অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে মনে করতেন।

খুরম তখন নূরজাহানের দল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারী। অপর পক্ষ কুমার খসরুকে সমর্থন করা স্থির করলেন। খসরুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁর নির্য্যাতন, তাঁর দুঃসাহসিক জীবনকাহিনী

তাঁকে জনসাধারণের প্রিয় করে তুলেছিল। অন্তঃপুরের বেগমেরা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পুরাতন ওমরাহগণ নূরজাহানের স্বৈরাচারে বিরক্ত হয়ে কুমার খসরুকে সিংহাসনে স্থাপনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন।

নূরজাহানের দলভুক্ত লোকেরা পুরাতন ওম্রাহ্দের এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলেন এবং খসরুকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। অবশেষে ১৬১৬ খৃঃ অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্দী খসরুকে আসফ খাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন "বিশেষ কারণবশতঃ অনি রায় সিংহের তত্ত্বাবধান থেকে কুমার খসরুকে আসফ খাঁর তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হ'ল।" সেই সময়ে রাজদরবারে অবস্থিত ইংরাজ রাজদূত স্যর টমাস রো এ সম্বন্ধে একটি অতি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিবৃত করেছেন—

"ষড়যন্ত্রকারীদল স্থির করল কুমার খসরু জীবিত থাকতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোনই আশা নেই। কারণ খসরু ছিলেন প্রজা সাধারণের প্রিয় পাত্র। যদি কখনও খসরু মুক্তিলাভ করতে পারেন, যদি কোনওদিন তিনি সম্রাটের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হন তবে সেইদিনই কুমার খুরমের সাম্রাজ্যস্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাবে। নূরমহল বেগম তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে জাহাঙ্গীরকে বোঝাতে চাইলেন যে খসরুর উচ্চ আকাঙ্খা সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ নয়—কাজেই তাঁর সম্বন্ধে

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সম্রাট নূরজাহানের সে সতর্কতা বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। অবশেষে তাঁরা অন্য উপায়ে সম্রাটের আদেশ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করলেন। সম্রাটের অত্যধিক সুরাপানের সুযোগ গ্রহণ করে' খুরম ও আসফ খাঁ সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন যে খসরুর পদমর্য্যাদা ও নিরাপত্তার জন্য তাঁকে কুমার খুরমের হাতে সমর্পণ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ ভ্রাতার সাহচর্য্য খসরুর কাছে প্রীতিপ্রদ হ'বে। তাঁরা বিনীত-ভাবে কুমারের তত্ত্বাবধানের ভার প্রার্থনা করে সম্রাটের কাছে অনুমতি চাইলেন। সুরামত্ত সম্রাট সেই অনুমতি প্রদান করলেন। অবিলম্বে সেই রাত্রেই আসফ খাঁ রাজার আদেশ নিয়ে কুমার খুরম কর্ত্তৃক প্রেরিত হলেন খসরুর কারাগারে। খসরু তখন অনি রায় সিংহ নামে জনৈক রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁকে সম্রাটের আদেশ পত্র দেখানো হ'ল বটে কিন্তু তিনি কুমার খসরুকে খুরমের হাতে দিতে সম্মত হ'লেন না। তিনি আসফ খাঁকে বল্লেন যে খসরুর ভার তিনি সম্রাটের নিকট হ'তে পেয়েছেন, যদি সে ভার প্রত্যর্পণের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে তবে তিনি সম্রাটের হাতেই তা' করবেন, অন্য কাহারও হাতে নয়।" অনি রায়ের এই দৃঢ় উত্তর ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে' দিল। পরদিন প্রভাতে অনি রায় দরবারে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে গতরাত্রের ঘটনার কথা জানালেন। একথাও

তিনি সেই সঙ্গে বল্লেন যে কুমার খসরুকে তাঁর শত্রুর হাতে সমর্পণ করা অপেক্ষা তিনি তাঁর চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সম্রাট তাঁর বিশ্বস্ততায় সন্তোষ প্রকাশ করে' তাঁর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র বিফল হ'লেও ষড়যন্ত্রকারীরা হতাশ হ'লেন না। অবশেষে যখন কুমার খুরম দাক্ষিণাত্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তাঁরা স্থির করলেন যে খসরুকে আগ্রায় রেখে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অশুভকর হতে পারে। জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন তাতে খুরমের অনুপস্থিতির সুযোগে খসরু সিংহাসন অধিকার করতে পারেন। কুমার খুরম দাক্ষিণাত্য অভিযানের পূর্ব্বে কুমার খসরুর ভার চাইলেন। কারণ দেখালেন যে অভিযানে দুই কুমারই উপস্থিত থাকলে বিদ্রোহী দল ভীত হ'বে। স্ত্রীবুদ্ধি পরিচালিত সম্রাট ষড়যন্ত্র-কারীদের আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল সম্রাট তখন তাদের ভয় করতে সুরু করেছিলেন, তিনি খসরুকে খুরমের হাতে সমর্পণ করলেন।

জনসাধারণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। স্যর টমাস সেকথা তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ ক'রে গেছেন। সম্রাট যে এইভাবে কুমার খসরুকে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করেছেন একথা প্রকাশ্যেই সকলে প্রচার করতে লাগল। এই সময়ে মোগল দরবারে উত্তেজনা ও অশান্তির সীমা ছিল না। যে কোনও মুহূর্ত্তেই একটা গৃহ-বিপ্লবের আশঙ্কা করা হচ্ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা মোগল প্রাধান্যের নিকট মেবারের বশ্যতা স্বীকার। আকবরের রাজত্ব-কালে সেলিম একবার মানসিংহের সঙ্গে মেবার আক্রমণ করেছিলেন। রাণা প্রতাপসিংহের বিলাসী পুত্র অমরসিংহ তখন মেবারের সিংহাসনে আসীন। রাণা প্রতাপের সুযোগ্য সেনাপতিবৃন্দ সেই সময়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের কোনও নিশ্চিত ফলাফলের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে বিদ্রোহের সংবাদে মানসিংহ রাজপুতনা ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধে অনুৎসাহী সেলিম এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পরে জাহাঙ্গীর রাজপুতনা অভিযানের এক বিরাট আয়োজন সুসম্পূর্ণ করলেন। আসফ খাঁর অধীনে সেই বিরাট বাহিনী রাজপুতনা অভিমুখে যাত্রা করে। সেই বিরাট শক্তিশালী বাহিনী মেবারের দ্বারদেশে উপস্থিত হলে অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রতাপসিংহের সেনাপতিবৃন্দ তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁরা বলপ্রয়োগে অমরকে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করালেন। রাজপুত চারণেরা এই যুদ্ধে রাজপুতদের বিজয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আবার অন্যদিকে পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিকেরা মোগল রাজ-শক্তির জয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মোটের উপরে

একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই যুদ্ধের ফল সঠিক ভাবে নির্নীত হয় নি। আগ্রায় এই সময়ে খসরুর বিদ্রোহের জন্য আসফ খাঁ রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি করে' আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এর দুই বৎসর পরে রাজপুতনায় আবার মোগল সৈন্য প্রেরিত হয় মহাবৎ খাঁর অধীনে। মহাবৎ খাঁ যথেষ্ট বীরত্ব ও কৌশলের সঙ্গে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। সম্রাট সেই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মহাবৎ খাঁকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা রূপে প্রেরণ করেন। রাজপুতনা জয়ের জন্য কুমার খুরমকে সঙ্গে নিয়ে জাহাঙ্গীর স্বয়ং যাত্রা করেন। খুরম অসাধারণ বীরত্ব বুদ্ধি কৌশল ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে রাজপুত জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ফলে মেবারের গ্রাম নগর প্রভৃতি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়ে গেল, রাজপুত সৈন্যেরা দলে দলে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন আহুতি দিল। সমস্ত মেবার দুঃখ দুর্দ্দশার চরম শিখরে উপনীত হ'ল।

অপর দিকে অগণিত মোগল সৈন্য তাদের অপর্য্যাপ্ত খাদ্য-সম্ভার ও আয়োজন নিয়ে দিনের পর দিন অগ্রসর হ'তে লাগল। দুর্দ্দশাগ্রস্থ রাজপুত জাতি অবশেষে শান্তির জন্য আকুল হ'য়ে উঠল। দেশবাসীকে এই সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অমরসিংহ মোগল সম্রাটের কাছে সন্ধির সংবাদ পাঠালেন। খুরম এই জয়ের সংবাদ আজমীরে সম্রাটের কাছে প্রেরণ

করলেন। জাহাঙ্গীর সন্ধির সর্ত্তে সম্মতি দান করলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাজপূত জাতি মোগল সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেন। অমর সিংহের পুত্র করণ সিংহকে মোগল দরবারের প্রতিভূহিসাবে অবস্থান করতে হবে, তবে অমর সিংহ স্বয়ং মোগল দরবারে উপস্থিতির গ্লানি থেকে রেহাই পেলেন।

এই ভাবে রাজপুতনা বিজয় সম্ভব হল। আকবরের অসমাপ্ত কাজ জাহাঙ্গীর সমাপ্ত করলেন। রাজকুমার করণকে সঙ্গে নিয়ে খুরম আজমীর যাত্রা করলেন। করণকে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কুমার করণ তাঁর পরাধীনতার জন্য সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকতেন, এটা জাহাঙ্গীর লক্ষ্য করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন —"কুমার করণ আবাল্য পর্ব্বত ও অরণ্যে বর্দ্ধিত। মোগল রাজদরবারের ঐশ্বর্য্য ও সমারোহ দেখার মত সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটেনি। তাই তাঁকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করার জন্য আমি প্রত্যহই অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে দরবার আহ্বান করতাম এবং নানাপ্রকার মূল্যবান মণিমুক্তা উপহার দিয়ে তাঁকে বিস্মিত ক'রে দিতাম"।

জাহাঙ্গীর বীর ও উদার ছিলেন। বীরের বীরত্ব ও মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারতেন তিনি। রাজপুতনার যুদ্ধ জয়ের পর তিনি রাণা অমর সিংহ ও কুমার করণ সিংহের অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় দুইটি মূর্ত্তি আগ্রার উদ্যানে স্থাপন করে তাঁদের বীরত্বের পূর্ণ মর্য্যাদা দান করেন।

এই সময়ে স্যার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে রাজার দরবারে আসেন—বাণিজ্যচুক্তির জন্য। যদিও তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় বিশেষ সফলকাম হন নি, তবুও মোগল রাজদরবারে এই উপস্থিতি ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। তাঁর লেখা জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের বিবরণী পাঠ করলে মোগলসাম্রাজ্যের রীতিনীতি ও শাসন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৬১৫ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী পনেরো জন সঙ্গীসহ ইংলণ্ডের রাজদূত স্যর টমাস রো ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৬১৫ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি সুরাটে পৌছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মোগল দরবারে পৌছুতে তাঁর বিলম্ব ঘটে। ১৬১৬ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী তিনি মোগল দরবারে পৌছেন।

জাহাঙ্গীর যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজদূতকে গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বাণিজ্য সুবিধার জন্য সম্রাটের নিকট স্যর টমাস এক বিশেষ আদেশ পত্র প্রার্থনা করেন। স্যর টমাস রো'র প্রার্থিত আদেশ পত্রের সর্ত্তগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

গ্রেট-ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্য অধিকার লাভ করবে।

ইংরাজ বণিকদের ও তাঁদের ভৃত্যদের কোনওপ্রকার পরীক্ষা করা হবে না।

শুল্কবিভাগে ইংরেজদের বাণিজ্যদ্রব্য ২৪ ঘণ্টার বেশী আটক থাকবে না।

উপযুক্ত মূল্য ভিন্ন কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাণিজ্যদ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতে পারবেন না।

বণিকগণ যাঁর নিকটে ইচ্ছা বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে পারবেন এবং ভারতবর্ষের যেখানে ইচ্ছা বাণিজ্যদ্রব্য প্রেরণ করতে পারবেন কিন্তু এর জন্য অতিরিক্ত মাশুল তাঁরা প্রদান করবেন না।

মোগল-সাম্রাজ্যের যে কোনও দ্রব্য ইংরাজ-বণিকেরা ক্রয় করতে পারবেন, এবং বন্দরের সাধারণ শুল্ক দানের পরিবর্ত্তে সেই সব দ্রব্য ভারতবর্ষের বাইরে পাঠাবার অধিকার তাদের থাকবে।

বন্দরের শাসনকর্ত্তার অনুজ্ঞাপত্রের বিনিময়ে ইংরাজ বণিকের বাণিজ্যদ্রব্য আর পরীক্ষিত হবে না।

বন্দরে ইংরাজ জাহাজ উপস্থিত থাকার জন্য অতিরিক্ত কোনও মাশুল তাঁদের দিতে হ'বে না।

এই সব আদেশ ভঙ্গের অপরাধে মোগল রাজদরবার যে কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।

ইংরাজেরা তাঁদের শত্রু ব্যতীত আর সকল জাতিকেই সমুদ্রপথে চলাচলের অনুমতি দেবেন।

উপযুক্ত মূল্যে ইংরাজ বণিক সম্রাটের আকাঙ্খানুযায়ী ইউরোপের বিখ্যাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করবেন।

মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে ইংরাজেরা সর্ব্বদাই রাজশক্তিকে াহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন।

ছয় মাসের মধ্যে পর্ত্তুগীজ বণিকদের ইংরাজের সঙ্গে সন্ধিপত্র

স্বাক্ষর করতে হবে, নইলে ইংরাজেরা তাঁদের সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করবেন।

সাধারণভাবে এই হ'ল বাণিজ্যচুক্তির সর্ত্তাবলী। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর ও রাজ্যের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করা রাজকীয় সম্মানের হানিকর বলে' মনে করলেন। স্যর টমাসের সকল প্রকারের বুদ্ধি-কৌশল ও চাতুর্য্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ স্যর টমাস ১৬১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজদরবার পরিত্যাগ করে সুরাট যাত্রা করেন। ১৬১৯ খৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ডে রওনা হন।

এই বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্যর টমাসকে দীর্ঘকাল রাজদরবারে অবস্থান করতে হয়েছিল, সেই সময়ে মোগল রাজদরবারের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত, স্যর টমাস তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে ২রা সেপ্টেম্বর সম্রাটের জন্মতিথি উৎসব হত। সম্রাট এইদিন স্বর্ণ রৌপ্য ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যাদির সঙ্গে ওজন হতেন। জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এই ওজন করা ব্যাপারটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। স্যর টমাস বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন। সম্রাটের উদ্যানে একটি সুন্দর ও জাঁকজমক পরিপূর্ণ শিবিরে এই উৎসব সম্পাদিত হত। পেটা সোনায় তৈরী হত ওজন করার মানদণ্ডটি। মণিমুক্তায় খচিত পাল্লা সোনার শিকল ও রেশমের

দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকত। এই উৎসবে আমন্ত্রিত হতেন রাজ্যের বিশিষ্ট লোকেরা। সম্রাট আসতেন সেখানে বিশেষ ভাবে অলঙ্কার ও মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। সম্রাট সেই মানদণ্ডের একদিকে উপবেশন করতেন, অপরদিকে রাখা হ'ত কতগুলি পুলিন্দা। স্যর টমাস রো'র প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে জানানো হ'য়েছিল যে ঐ সব পুলিন্দার ভিতরে আছে রৌপ্য। এইভাবে সম্রাট ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর ও বস্ত্রাদির সঙ্গে ওজন হতেন। সর্ব্বশেষে তাঁকে ওজন করা হত মধু, মাখন ও বিভিন্ন রকমের শস্যের সঙ্গে। স্যর টমাস দেখেছিলেন এই উৎসবের সময়ে সম্রাটের সম্মুখে বৃহৎ পাত্রে রাখা হত স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানা আকারের ফল। উৎসব-শেষে সম্রাট সেগুলি উপস্থিত জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিতেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সম্রাটের এই অনুগ্রহ চিহ্নলাভের জন্য সেগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করতেন।

জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষ্যে মোগল রাজদরবার বিশেষ ভাবে সজ্জিত হ'ত। স্যর টমাস লিখেছেন যে বহুমূল্যবান ঐশ্বর্য্য সম্পদের এমন বিপুল সমাবেশ তিনি আর দেখেননি। তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তিনি যখন রাজদরবারে উপস্থিত হলেন তখন সম্রাট তাঁর প্রিয় হস্তী দর্শন করছিলেন। শত শত হস্তী মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের আভরণে সজ্জিত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। এই সুশিক্ষিত হস্তীদের দেখে স্যর

টমাস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন "দৃশ্যটি অত্যন্ত চমৎকার, বন্যপশুর এমন সুন্দর একত্র সমাবেশ আমি আর কোথাও দেখিনি।"

জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষ্যে সম্রাট স্যর টমাসকে একটি সোনার কাপ, প্লেট ও ঢাকনী উপহার দেন। এটী পেয়ে স্যর টমাস অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি এর সম্বন্ধে লিখে গেছেন যে প্রত্যেকটি জিনিষেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুনির কাজ করা ছিল। ঢাকনীটির উপরে ছিল একখানি বৃহৎ আকারের চুনি—তার চারিদিকে পান্না ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর কাজ। কাপ, প্লেট ও ঢাকনীতে প্রায় কুড়ি আউন্সের মত সোনা ছিল, এবং সর্ব্বসমেত দুই হাজার চুনি পান্না প্রভৃতি প্রস্তর তাদের মধ্যে খচিত ছিল।

স্যর টমাস তাঁর বিবরণীর অন্য একস্থানে সম্রাটের 'নওরোজ উৎসবের বর্ণনা করে গেছেন। নববর্ষকে অভিনন্দন জানাবার উৎসব এটা। এই উৎসব পারস্য দেশের রীতি অনুযায়ী হত এবং নয়দিন ধরে এ উৎসবের অনুষ্ঠান চলত। উৎসব উপলক্ষ্যে দরবার গৃহ সুবর্ণ নির্ম্মিত সামিয়ানায় সজ্জিত হত, দরবার গৃহের ভূমিতে পাতা হ'ত পারস্যের মূল্যবান গালিচা। দরবারের চারিদিকে সমবেত হ'তেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সম্রাটকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। দরবার গৃহে স্থাপিত হত চারফিট উচ্চ চতুষ্কোণ সিংহাসন। সিংহাসনের পরে সুবর্ণ আবরণ। তার চারিপাশে মুক্তার মালা

আর—তারই সঙ্গে সজ্জিত থাকত স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত আপেল, নাসপাতি, বেদানা আঙ্গুর প্রভৃতি নানারকম ফল।

দরবার কক্ষের বাইরে সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের জন্য নির্ম্মিত পৃথক পৃথক শিবিরে বাস করতেন। সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কালে তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত নববর্ষের উপহার নিয়ে আসতেন, উৎসবের শেষে সম্রাট সেইসব উপহারের সঙ্গে আরও মূল্যবান জিনিষ দিয়ে তাঁদের প্রত্যর্পণ করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। উপহারের দ্রব্যাদি থেকে সম্রাট অতি সামান্যই নিজের জন্য গ্রহণ করতেন।

উৎসবের সময়ে স্যর টমাস রো'র আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল সম্রাটের দক্ষিণ দিকে। নওরোজের উৎসব প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন।

স্যর টমাসের মোগল রাজদরবারে অবস্থান কালে পারস্য সম্রাট শাহ্ আব্বাস মোগল দরবারে রাজদূত প্রেরণ করেন। স্যর টমাস সে সম্বন্ধেও তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে পারস্যের রাজদূত কি বিরাট উপহার সম্ভার নিয়ে এসেছিলেন। এই উপহারের মধ্যে ছিল তেজস্বী বলিষ্ঠ আরব দেশীয় অশ্ব। সাতটি উটের পিঠে এসেছিল ভেলভেট, একুশটি উটে বোঝাই দ্রাক্ষারস আর সাতটি উটের পিঠে ছিল গোলাপ জল। এ ছাড়া পারস্যের রেশমের গালিচা, স্বর্ণবস্ত্র, মণিমুক্তা খচিত তরবারী, ভেনিসের আয়না, প্রভৃতি দ্রব্যে সে উপহার সমৃদ্ধ ছিল। স্যর টমাস এই ঐশ্বর্য্যের সমারোহে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

স্যর টমাস রো চিত্রশিল্পের প্রতি জাহাঙ্গীরের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ছোট একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। স্যর টমাস সম্রাটকে ইংলণ্ডে অঙ্কিত একখানি চিত্র উপহার দিয়েছিলেন। স্যর টমাসের বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় চিত্রকর এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন না। সম্রাট রাজদূতের এই মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি তাঁর দরবারের চিত্রকরকে দিয়ে সেই চিত্রটির পাঁচখানি প্রতিলিপি করান। চিত্র অঙ্কিত হয়ে গেলে স্যর টমাসকে তিনি তাঁর নিজের চিত্রখানি বেছে নিতে বলেন। সব কখানি চিত্রই এত সুন্দর হয়েছিল যে টমাস রো তাঁর চিত্রখানি প্রথমে চিনে বের করতে পারেননি। পরে অবশ্য বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে তিনি তাঁর চিত্রখানি চিনতে পারেন। এই ব্যাপারে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষে বিস্ময় প্রকাশ করেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হ'য়ে স্যর টমাস রো'কে ভারতীয় চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র উপহার দেন। সম্রা ্ট টমাস রো'কে চিত্রখানি ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন—চিত্রখানি দেখে যাতে ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা পরিবর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষের চিত্রকরেরা যে চিত্রবিদ্যায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, স্যর টমাস রো'র ধারণা অনুযায়ী তাঁরা যে এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না সেই বিষয়টিই প্রমাণ করা সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল।

জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও টমাস রো

তার 'জার্ণালে' আলোচনা করেছেন। সাধারণতঃ সম্রাট প্রতিদিন তিনবার দরবারে উপস্থিত হতেন। প্রজাদের পরে সুবিচারের জন্য তাঁর আগ্রহের অভাব ছিলনা। সুশাসনের জন্য তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল, তিনি অনেকগুলি অন্যায় কর বা শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলস্য ও দুর্ব্বলতাই ছিল তাঁর সর্ব্বপ্রধান দোষ, তাই তিনি বুদ্ধিমতী নূরজাহানের ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মোগল দরবারের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরে স্যর টমাস রো বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নিয়েই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিংহাসন আরোহণের পরে জাহাঙ্গীর খসরুর বিদ্রোহ, কান্দাহার অভিযান প্রভৃতির কার্য্যে অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত থাকায় দাক্ষিণাত্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। অবশেষে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা স্থাপন করে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি দিলেন সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের আভাস দেখা দিয়েছে। জাহাঙ্গীর তাঁর সমস্ত শাসনকাল দাক্ষিণাত্যে এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনানায়কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন —সেই বীর সেনানায়কের নাম মালিক অম্বর।

মালিক অম্বর একজন হাবসী ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের আহমদ নগরের রাজার অনুচর হিসাবে জীবনযাত্রা সুরু করেছিলেন। তাঁর অধীনে থাকার সময়ে মালিক অম্বর বেরার প্রদেশ অধিকার করেন। প্রভুকে বিশেষ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। ক্রমে তিনি নিজামশাহী রাজের বিশেষ উপদেষ্টা ও প্রিয়পাত্র হ'য়ে দাঁড়ান। তাঁর সুচিন্তিত বিচারপদ্ধতি ও সুশাসনের প্রশংসা মোগল ঐতিহাসিকেরাও করে গেছেন। মালিক অম্বর রাজা তোডরমলের রাজস্ব পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যে প্রচলন করেছিলেন। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে আহমদ নগরের পতনের পরে তিনি এক পার্ব্বত্য প্রদেশে পুরাতন রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে প্রতিষ্ঠা করে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

মোগল সৈন্যদের সঙ্গে মালিক অম্বর গেরিলা-যুদ্ধ-প্রণালী অবলম্বন করতেন। মালিক অম্বরের যুদ্ধে সাজ সরঞ্জাম অত্যন্ত হালকা ধরণের ছিল। তিনি সৈন্যদের জন্য দ্রুতগামী মারাঠী অশ্বের প্রচলন করেন। এই সব সৈন্যের দ্রুত ও আকস্মিক আক্রমণে মোগল সৈন্য বারে বারে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠাজাতি সমুদ্র ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসবাস করত। মারাঠা জাতির এই সময়ে হ'তেই ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের অধীনে তারা সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি এই সব মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিশেষ করে তারা প্রভাব বিস্তার করে আহমদ নগরের নিজাম-শাহী বংশে। দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলে লঘু দ্রুতগামী মারাঠা অশ্ব বিশেষ কার্য্যকরী বলে প্রতিপন্ন হওয়ায় মালিক অম্বর মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেইজন্য তাঁর সৈন্যদের জন্য প্রচুরভাবে মারাঠা অশ্ব সংগ্রহ করেন। অবশেষে এই সুগঠিত সৈন্যসহ অম্বর মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে মালিক অম্বর জঙ্গল যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করেন। মোগল-সৈন্যের সঙ্গে কোনও প্রকার বৃহৎ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ যে পরাজয় স্বীকার করা সেকথা তিনি খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নানা দিক দিয়ে মোগল সৈন্যকে তিনি বিব্রত করে তুলতেন। ছোট

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান,

শাহজাদা খুরম

সৈন্যদল মোগল সৈন্যদের প্রলুব্ধ করে তাদের পার্ব্বত্য অঞ্চল কিংবা গভীর অরণ্যে নিয়ে যেত এবং সেইখানে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করা হত চারিদিক থেকে। এইভাবে সমগ্র দলটির ধ্বংস সাধন করা হত। রসদ লুণ্ঠন করে, যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে এবং আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা ক্রমশঃ তারা মোগল সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত করে তুলল। কারণ মোগল সৈন্য এই জঙ্গল-যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবে অনভিজ্ঞ ছিল। ক্রমে মালিক অম্বরের শিক্ষা ও উৎসাহে এই সৈন্যদল উত্তর ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের পক্ষে বিভীষিকার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। মালিক অম্বর মোগল অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির উদ্ধারে ব্রতী হলেন। মোগলসেনানায়কদের গৃহবিবাদ ও অনুদারতায় সে কাজ অতি সহজেই সমাধা হ'ল।

১৬০৮ খৃঃ বারো হাজার সৈন্যসহ খান খানানকে জাহাঙ্গীর প্রেরণ করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও সুফল দেখা গেল না। তখন কুমার পারভেজকে প্রধান সেনাপতিরূপে প্রেরণ করা হয়। পারভেজ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী হলেও অতিরিক্ত সুরাপান ও বিলাসিতার জন্য অপদার্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষতঃ যুদ্ধকৌশলে তিনি ছিলেন অনভ্যস্ত। সুতরাং তাঁর উপস্থিতিতে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। যুদ্ধ পূর্ব্বের মতই চলতে লাগল। বীর মালিক অম্বরের শক্তি বর্দ্ধিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। এর পরে জাহাঙ্গীর খান্ জাহান লোদীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন। খান জাহান লোদী

বারহানপুরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে ইতিমধ্যেই সেখানে মোগল সৈন্যের পরাজয় ঘটেছে কয়েকবার। খান খানান নূতন সৈন্যদের উপস্থিতিতে শত্রুর পরে এক অতর্কিত আক্রমণের উদ্যোগ করলেন। স্থানীয় সেনানায়কেরা তাঁকে এই ভাবে আক্রমণ না করার জন্য বহু পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের কথা অগ্রাহ্য করে মালিক অম্বরের সৈন্যের পরে এক আকস্মিক আক্রমণ করেন। মালিক অম্বর তাঁর সৈন্যসহ দ্রুত পশ্চাৎ অপসরণ করতে লাগলেন। বিজয়লাভ অতি সহজসাধ্য মনে করে খান খানান সসৈন্যে তাঁদের অনুসরণ করলেন। অবশেষে দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গভীর পার্ব্বত্য-অরণ্যের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন খান খানান। মালিক এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। খান খানান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন। এর পরে আবদুল্লা খাঁ, খান জাহান ও মানসিংহের সম্মিলিত চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল। বারে বারে এই পরাজয়ে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি যে কোনও উপায়েই হোক দাক্ষিণাত্য জয়ের আদেশ দিলেন। খান খানান কৌশলে অর্থলোভ দেখিয়ে মালিক অম্বরের সেনা-নায়কদের আপন দলে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। অর্থলোভে বহু সেনানায়ক মালিক অম্বরের পক্ষ পরিত্যাগ করে' মোগল-সৈন্যের সঙ্গে যোগ দেন। এই ভাবে মালিক অম্বরের শক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। এই সময়ে খুরম দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে আসেন। নবেম্বরের প্রথম দিকে তাঁর বিজয় লাভে সন্তোষ

প্রকাশ করে জাহাঙ্গীর তাঁকে শাহ্ অর্থাৎ রাজা উপাধি দান করেন। তৈমুর বংশের অন্য কোনও কুমার এই উপাধি অর্জ্জনের সৌভাগ্যলাভ করেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রের নিকট অবস্থান করার জন্য স্বয়ং সম্রাটও মাণ্ডু দুর্গে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে শাহ্ খুরম দক্ষিণাপথের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হ'লেন। জাহাঙ্গীর ও শাহ্ খুরম—এই উভয়ের উপস্থিতিতে মালিক অম্বর ভীত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে খুরম মালিক অম্বরের নিকট সন্ধিপত্র পাঠালেন। মালিক অম্বর এই সুযোগ অবহেলা করলেন না। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী মোগলসাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্যের দেশগুলিকে মালিক অম্বর মোগল সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হলেন। সেই সঙ্গে বার্ষিক কর প্রদানেও সম্মত হলেন। খুরম এই সন্ধির কথা মাণ্ডুদুর্গে সম্রাটের কাছে প্রেরণ করলেন। নূরজাহান বেগম এই সুসংবাদ নিজেই সম্রাটের নিকট উপস্থিত করেন। সম্রাট এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সংবাদদাত্রীকে দুই লক্ষ টাকা আয়ের একটি জায়গীর উপহার দেন। দীর্ঘদিন পরিশ্রমে দাক্ষিণাত্য বিজয় সুসম্পন্ন হওয়ায় চতুর্দ্দিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। শাহ্ খুরম 'শাহ্ জাহান' অর্থাৎ পৃথিবীর সম্রাট এই আখ্যায় ভূষিত হ'লেন। সম্রাট তাঁকে বহু মূল্যবান উপহারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন।

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ প্রশমনের পর জাহাঙ্গীর প্রায় দুই মাস কাল গুজরাটে অবস্থান করেন। শিকার করা তাঁর অতি প্রিয় জিনিষ ছিল। গুজরাটে হস্তীশিকারে তিনি অত্যন্ত আনন্দ

উপভোগ করেন। এই সময়ে গুজরাটে সর্দ্দিগর্ম্মি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাতুর্ভাব দেখা দেয়। জাহাঙ্গীর এই রোগের কারণ নির্দ্দেশ করে বলেছেন যে সম্ভবতঃ অতিরিক্ত গরমে বাতাস দূষিত হওয়ায় এই রোগের উৎপত্তি। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

অবশেষে স্থানীয় আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য ২রা সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীর আগ্রা যাত্রা করেন। এই সময়েই শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজীব জন্মগ্রহণ করেন। (১৬১৮ খৃঃ ২৪ অক্টোবর) আগ্রায় এই সময়ে মহামারীরূপে বিউবনিক প্লেগ দেখা দেয়। এই ভয়াবহ রোগ সর্ব্বপ্রথম পাঞ্জাবের পশ্চিম অঞ্চলে সুরু হয়। সম্ভবতঃ ১৬১৬—১৭ খৃষ্টাব্দে এই রোগ মধ্য এসিয়া থেকে শীতের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসে। জাহাঙ্গীর এই রোগের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন—"এই রোগের লক্ষণ স্বরূপ হাত বা পায়ের সংযোগস্থল স্ফীত হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে গলায়ও এই স্ফীতি দেখা যায় এবং তারপরেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।"

বিদ্যুৎগতিতে এই রোগ লাহোর, সিরহিন্দ, দিল্লী ও আগ্রায় বিস্তার লাভ করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মোতাম্মদ খাঁ এসম্বন্ধে বলেছেন "এই রোগের প্রাতুর্ভাবের পূর্ব্বে ইন্দুর খুব অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সেই গৃহের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অবিলম্বে মারা যায়। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। কেহ মৃতব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেও তার মৃত্যু ঘটে। লাহোরে এই

রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয়। দলে দলে লোকেরা মৃতদেহ পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মৃতব্যক্তির সৎকার পর্য্যন্ত কেহ করে না। দীর্ঘ আট বৎসর ধরে এই দুর্দ্দান্ত রোগ হিন্দুস্থানের সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করে।"

জাহাঙ্গীর স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে তাঁর শোনা একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।—"রাজপরিবারের জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা বলেন—'একদিন আমি একটি ইন্দুরকে অস্থির-ভাবে ছুটোছুটি করতে দেখি। আমি আমার পরিচারিকাকে ঐ ইন্দুরটি বিড়ালের মুখে দেবার আদেশ করি। সে আদেশ পালন করা মাত্র বিড়ালটি তাকে খেয়ে ফেলে। পরক্ষণেই বিড়ালটি অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ সে যন্ত্রণায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন তাকে একটু আফিম খাওয়ানো হয়—তিন দিন যন্ত্রণাভোগের পর সে ধীরে ধীরে চেতনা প্রাপ্ত হয়। এর পরে সেই পরিচারিকাটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন পরে তার মৃত্যু হয়। মাত্র আট নয় দিনের মধ্যে আমার গৃহের সতেরোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

এই মহামারীর কবল থেকে তখন কেবলমাত্র ফতেপুর সিক্রী রক্ষা পেয়েছিল। এর কারণ সিক্রীর চারিপাশে বহুদূর পর্য্যন্ত জনশূন্য হয়ে যাওয়ায় সিক্রীতে রোগ প্রবেশ করতে পারেনি। রোগ হ্রাস না পাওয়া পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর ফতেপুর সিক্রীতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে রোগের প্রকোপ কমলে আগ্রা দুর্গে তিনি প্রবেশ করেন।

নবম পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছিল এই সময়ে। অত্যধিক সুরা ও অহিফেন সেবনের জন্য তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েন। এ ছাড়া সর্দ্দিগর্ম্মি ও হাঁপানি প্রভৃতি রোগে তাঁর অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। ১৬১৯ খৃঃ তিনি সাংঘাতিক ভাবে চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হন। চোখে অত্যধিক রক্ত জমায় তিনি প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েন। যন্ত্রণা উপশমের জন্য চিকিৎসক তাঁর চোখের শিরা কেটে দিয়ে অতিরিক্ত রক্ত বের করে দেন। এই চিকিৎসায় জাহাঙ্গীরের চোখের যন্ত্রণার কিছু উপশম হলেও স্বাস্থ্য তাঁর একেবারেই ভেঙ্গে গেল। ১৬২০ খৃঃ তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে যান স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি একটি অতি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জাহাঙ্গীরের কবি-প্রতিভার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় এই বর্ণনায়। তিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে বলেছেন "কাশ্মীর চির বসন্তের উদ্যান। এর মাঠে মাঠে অজস্র ফুলের সমাবেশ। ঈশ্বরের আরাধনার পক্ষে এর চেয়ে উদার ও মুক্ত পরিবেষ্টনী আর হতে পারে না। কাশ্মীরের বিস্তৃত সবুজ মাঠের তুলনা নেই। অগণিত নৃত্যশীলা পার্ব্বত্য নদী আঁকাবাঁকা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। রক্তগোলাপ, ভায়োলেট ও নর্সিসাস ফুলের ছড়াছড়ি। এখানে সেখানে নানাবর্ণের ফুল ও সুগন্ধি লতার সমারোহ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে, কাশ্মীর অধিবাসীদের গৃহের প্রাচীরে প্রাচীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বনফুল ও সুন্দর বনলতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য। ভাষা হার মানে সেই শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে।" কাশ্মীরের গৃহগুলিকে জাহাঙ্গীর প্রধানতঃ কাঠের তৈরী দেখেছিলেন। গৃহের ছাদের পরে অধিবাসীরা রোপন করত এক রকম ফুলের লতা, যার ফুল সারা বছরই গৃহখানিকে সজ্জিত করে রাখত। কাশ্মীরের উদ্যানে জাহাঙ্গীর সাদা, নীল ও চন্দন রংয়ের যূঁই ফুল দেখেছিলেন। চন্দন রংয়ের যূঁই ফুল কাশ্মীরের বিশেষত্ব।

জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে জাফরানের চাষের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। বছরে তখন কাশ্মীরে প্রায় পাঁচশত মণ জাফরান উৎপন্ন হত। জাফরান ফুলের সৌন্দর্য্যের খুব প্রশংসা করেছেন জাহাঙ্গীর। এই ফুল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এর পাঁপড়ীর রং গোলাপী এবং ভিতরের রং কমলা লেবুর মত। এর চাষের জন্য বিশেষ কোনও পরিশ্রমের প্রয়োজন হত না। এগুলো সাধারণতঃ বিনাযত্নে এবং চেষ্টাতেই হত। দূর থেকে জাফরানের ক্ষেত দেখতে খুব চমৎকার। এর ফুলের একটা তীব্র গন্ধ আছে। সেই গন্ধ বেশী পরিমাণে গ্রহণ করলে মাথার যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেতে সম্রাট তাঁর উৎসব ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেছেন কতবার, অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটেছে অজস্র। সম্রাটের ভারী ভাল লাগত তাদের দেখতে।

কাশ্মীরের জলপ্রপাতগুলি জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিল। তিনি বলেছেন যে কাশ্মীর উপত্যকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য এই

জলপ্রপাতগুলি। এই সব ঝরণার তীরে সম্রাট দেখেছিলেন দীর্ঘ উন্নত সাদা ও কালো পপ্‌লার গাছের সারি। গাছগুলি পরস্পর পরস্পরের গায়ে হেলে পড়ায় যে সুন্দর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হত সম্রাট তারই ছায়ায় বসে দেখতেন ঝরণার সৌন্দর্য্য। বিখ্যাত 'বীরনাগ ঝরণাটির প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর বলেছেন "এই ঝরণাটি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ ঝরণা। কথিত আছে যে এই ঝরণায় এক বৃহৎ সাপ বাস করত, সেই জন্যই এর নাম হয়েছিল বীর নাগ। এই প্রপাতটি বিহাট নদীর উৎপত্তিস্থল। প্রপাতটি সৃষ্ট হয়েছে একটি তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল পাহাড় থেকে। যখন আমি যুবরাজ ছিলাম তখন এই ঝরণার পাশে একখানি গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়েছিলাম, সেই গৃহ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, গৃহটি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে অবস্থিত। গৃহের সম্মুখের ঝরণার জল সবুজ গাছ ও লতার ছায়ায় ছায়ায় ঘন সবুজ রং ধারণ করেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে সেই জলে। জলের ধারে ধারে রয়েছে পুষ্পিত বনলতা ও সুগন্ধি গাছ। ময়ূরের পাখার মত ভারী সুন্দর এক রকম গাছের পাতা রয়েছে সেখানে।" ঝরণার সেই সুন্দর সহজ আবেষ্টনীতে জাহাঙ্গীরের কবি প্রকৃতি ভরে উঠত আনন্দে। দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করতেন কাশ্মীরের পুষ্পিত উপত্যকায়—তার তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে, স্বচ্ছ নৃত্যশীলা ঝরণার ধারে ধারে। কাশ্মীরকে তাঁর কাছে ভূস্বর্গ বলে মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—

"আগর ফিরদৌস্ বার্‌রুয়ে জমিন্ আস্ত্
হামিন আস্ত্ ও হামিন আস্ত্ ও হামিন আস্ত্"

"পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে তাহা এইখানে, তাহা এইখানে তাহা এইখানে।"

এরপরে এক অদ্ভুত নদীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। নদীর নাম 'অন্ধনাগ'। জাহাঙ্গীর লিখছেন "আমি জানতে পেলাম এই নদীর সমস্ত মাছ নাকি দৃষ্টিশক্তিহীন। তৎক্ষণাৎ আমি জাল ফেলে সেই নদীর মাছ ধরবার আদেশ দিলাম, বারোটি মাছের মধ্যে তিনটি মাছের চোখ অন্ধ দেখা গেল। অপর নয়টি চক্ষুষ্মান ছিল। লোকের মুখে শুনলাম যে এই নদীর জলে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে থাকে।"

কিন্তু কাশ্মীর ভ্রমণে প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি পেলেও জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি দেখা গেল না। ক্রমাগত হাঁপানীর আক্রমণে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়ে। হাঁপানীর যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য জাহাঙ্গীর অত্যধিক মাত্রায় সুরাপান আরম্ভ করেন। এই সময়ে কেবলমাত্র নূরজাহানের অক্লান্ত সেবা ও যত্নে জাহাঙ্গীর কিছু পরিমাণে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্বের শক্তিকে আর ফিরে পেলেন না। ১৬২৩ খৃঃ তিনি নিজের হাতে আত্মজীবনী লেখা ত্যাগ করেন। তাঁর দরবারের ঐতিহাসিক মোতাম্মদ খাঁ সেই কাজে নিযুক্ত হন।

এখন হতে সমগ্র রাজ্যশাসনের ভার নূরজাহানের পরেই ন্যস্ত হল। কিন্তু সম্রাটের ভগ্নস্বাস্থ্য নূরজাহানের পক্ষে বিশেষ

চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যে কোনও মুহূর্ত্তেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা—সম্রাটের মৃত্যুর পরে নূরজাহানের প্রকৃত স্থান কোথায় সে কথা চিন্তা করে তিনি আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শাহ্‌জাহান এই সময়ে ত্রিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন। ক্রমাগত বিজয়লাভের দ্বারা শাহ্‌জাহান অভূতপূর্ব্ব যশের অধিকারী তখন। দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নূরজাহান সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন যে জাহাঙ্গীরের চরিত্রের সঙ্গে শাহ্‌জাহানের চরিত্রের কোনও সাদৃশ্য নেই। পিতার মত তিনি অপর কারুর দ্বারা পরিচালিত হবার লোক ছিলেন না। শাহ্‌জাহানও নূরজাহানের উচ্চাভিলাষ, সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃত্ব ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কথা জানতেন, এবং উভয়েই একথা স্থির জানতেন যে এক সাম্রাজ্যে নূরজাহান ও শাহ্‌জাহানের স্থান হওয়া অসম্ভব।

নূরজাহান আপন প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। বন্দী কুমার খসরু উন্নত চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। নূরহাজানের প্রাধান্য স্বীকার তিনি করবেন না। শাহ্‌জাহান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—নূরজাহানের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হলেও এখন নূরজাহানের কর্ত্তৃত্ব হ্রাস করার দিকেই তাঁর বিশেষ যত্ন। কুমার পারভেজ মদ্যপায়ী ও ভগ্নস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু তাঁর অদৃষ্ট-লিপি। জাহাঙ্গীরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রীয়ার তখন মাত্র ষোল বৎসরের। বিচার বুদ্ধিহীন, নম্রস্বভাবের এই কুমারকে

আপন ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহারের জন্য নূরজাহান স্থির করলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শের আফগানের কন্যার সঙ্গে নূরজাহান শাহ্রীয়ারের বিবাহ স্থির করেন। এইভাবে রাজ-দরবারে তিনটি প্রধান দলের সৃষ্টি হল। একদল ছিলেন খসরুর সমর্থনকারী—অপর দল শাহ্জাহানের রাজ্য প্রাপ্তির সাহায্য-কারী, তৃতীয় দলটি নূরজাহান সৃষ্টি করলেন তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে। নূরজাহান তাঁর এই কাজের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তাঁর বিরুদ্ধের সকল বাধাকেই অপসারিত করবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করলেন।

এই সময়ে নূরজাহানের মাতা অসমৎ বেগম মারা যান। নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ বা ইতিমৎদ্দোল্লার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ে। ইনি নূরজাহানের প্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজ্যের যে সঙ্কট মুহূর্ত্তে নূরজাহানের পক্ষে তাঁর পিতার সাহায্য অত্যন্ত বেশী আবশ্যক ছিল সেই সময়েই তিনি সেই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেন। এইভাবে যে শক্তিপুঞ্জের সাহায্যে নূরজাহান এ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করছিলেন তার অবসান ঘটল। শাহ্জাহান এখন নূরজাহানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রু। আসফ খাঁ তাঁর জামাতা শাহ্জাহানের পক্ষপাতী। নূরজাহান এখন সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীহীন—একাকী আপন তেজস্বিতা ও মনস্বিতায় ভারত ইতিহাসের রাজনৈতিক গগনে জ্যোতিষ্কের মত প্রোজ্জ্বল!

দশম পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যে মালিক অম্বরের নায়কত্বে আবার বিদ্রোহের আভাস দেখা দিল। সেইখানে অবস্থিত মোগল সেনাপতি খান খানান সাহায্যের জন্য আগ্রায় সংবাদ প্রেরণ করলেন। জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাহানকে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হবার আদেশ দেন। শাহ্‌জাহান এই অভিযানে সহসা স্বীকৃত হলেন না। অবশেষে কি কৌশলে বন্দী খসরুকে হস্তগত করে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন সে কাহিনী ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। লাহোরে শাহ্‌জাহান পিতার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেন। পিতাপুত্রে আর সাক্ষাৎ হয়নি।

দাক্ষিণাত্যে শাহ্‌জাহানের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। দ্রুত অনুসরণের দ্বারা শাহ্‌জাহান শত্রুদের বিপর্য্যস্ত করে তুললেন। অবশেষে মালিক অম্বর দৌলতাবাদ হতে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। নানা-কারণে জাহাঙ্গীরও শীঘ্র যুদ্ধ সমাপ্তির পক্ষপাতী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত সহজ সর্ত্তেই শাহ্‌জাহান সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। মাত্র ছয়মাসের মধ্যে এইভাবে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে শাহ্‌জাহানের যশগৌরব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পর কয়েক মাস যাবৎ শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে মোগলশক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যে নিযুক্ত

ছিলেন। এই সময়ে ১৬২১ খৃঃ আগষ্ট মাসে শাহ্‌জাহান জাহাঙ্গীরের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পান। ইহারই অল্প পরে খসরুর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। সমসাময়িক অনেকের মতানুযায়ী শাহ্‌জাহান খসরুকে হত্যা করিয়েছিলেন। গভীর রাত্রে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। কয়েকদিন এই সংবাদ গোপনে রাখার পরে শাহজাহান সম্রাটের কাছে সংবাদ পাঠান যে রোগাক্রান্ত হয়ে খসরু প্রাণত্যাগ করেছেন। সম্রাটের কাছে যথাসময়েই শাহজাহান কর্তৃক খসরুর হত্যার কথাও পৌঁছয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুতে জাহাঙ্গীর গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। রাজদরবারের অনেকেই কামনা করেছিলেন যে জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাহান ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি দেবেন। কিন্তু বিপুল সাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করে জাহাঙ্গীর তাঁর একমাত্র শক্তিশালী উপযুক্ত পুত্রকে শাস্তি দিতে পারলেন না। খসরুর রোগে মৃত্যুর সংবাদকেই বিশ্বাস করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

এইভাবে মোগল রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজকুমার খসরুর বিড়ম্বিত জীবনের শেষ অধ্যায় অভিনীত হয়ে গেল। মোগল সাম্রাজ্য একটি অতি উজ্জ্বল রত্ন হতে অকালে বঞ্চিত হল। খসরুর দেহ জাহাঙ্গীরের আদেশে আগ্রায় আনা হল। সেখান থেকে তাঁকে এলাহাবাদে নিয়ে গিয়ে তাঁর মায়ের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হল। সমাধিক্ষেত্রের চারিপাশে করা হল সুন্দর উদ্যান নাম হল তার খসরুবাগ। মায়ের

পাশে খসরু চিরদিনের মত ঘুমিয়ে রইলেন। পিছনে রইল পড়ে রাজ্য, সিংহাসন, জীবনের উন্মত্ত অশান্ত কোলাহল।

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে, সাম্রাজ্যের পরে কর্ত্তৃত্বের দাবী নিয়ে নূরজাহান ও শাহ্‌জাহানের শত্রুতা চরমে উঠল। সম্রাজ্ঞী এই প্রতিভান্বিত যুবককে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য স্থির সঙ্কল্প হয়ে উঠলেন। সুযোগের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। এই সময়ে পারস্য সম্রাট আবার কান্দাহার অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্রাট শাহ্‌জাহানকে কান্দাহার অভিযানের ভার গ্রহণের আদেশ দেন। নূরজানের উদ্দেশ্য ছিল যদি শাহ্‌জাহান কান্দাহার যাত্রা করেন তা' হলে সেখানকার বিদ্রোহ দমন করে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে তাঁর দীর্ঘদিন সময় লাগবে। ততদিনে সম্রাজ্ঞী নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করে নিতে পারবেন। আর যদি শাহ্‌জাহান পিতৃ আদেশ অগ্রাহ্য করে কান্দাহার যাত্রা করতে অস্বীকার করেন তবে বিদ্রোহী বলে অতি সহজেই তাঁকে দমন করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

১৬০৬ খৃঃ পারস্য রাজের কান্দাহার অধিকারের প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর থেকেই পারস্যরাজ সুযোগের অন্বেষণ করছিলেন। কান্দাহার এই সময়ে মোগল সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পারস্য সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস সৈন্যের সাহায্যে কান্দাহার জয়ের আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশেষে তিনি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬১১ খৃঃ পারস্য থেকে রাজদূত আসে

মোগল দরবারে বহু মূল্যবান উপহার নিয়ে। শাহ্ আব্বাস এক পত্রে জাহাঙ্গীরের পরে নিজের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জাহাঙ্গীর বিনিময়ে মোগল দরবার থেকে রাজদূত প্রেরণ করেন পারস্য দরবারে। এইভাবে ১৬১১—১৬২০ খৃঃ পর্য্যন্ত পারস্য সম্রাট চারবার রাজদূত প্রেরণ করেন মোগল দরবারে। প্রতিবারই তিনি নানাপ্রকার মূল্যবান ও সৌখীন উপহার পাঠিয়ে জাহাঙ্গীরের সন্তোষবিধান করেন। ক্রমশঃ পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে মোগল সম্রাট ও সেনাপতিদের সন্দেহ দূর হয়। পারস্যের রাজদরবারে প্রেরিত মোগল দূতও ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে পারস্য সম্রাটের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ক্রমশঃ কান্দাহার রক্ষায় মোগল সৈন্যের শৈথিল্য দেখা দিল। শাহ আব্বাস এরই প্রতীক্ষা করছিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে সহসা একদিন সংবাদ পাওয়া যায় যে পারস্য সম্রাট কান্দাহার অবরোধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছেন। কিন্তু মোগল রাজদরবারের মনোযোগ তখন অন্যত্র গুরুতর রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সুদূর সীমান্তের কান্দাহার সমস্যা কিছু পরিমাণে অবহেলিত হয়। অবশেষে ১৬২২ খৃঃ মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে শাহ্জাহানের উপরে আদেশ দেওয়া হয় সৈন্যসহ কান্দাহার যাত্রা করার জন্য। সীমান্ত থেকে এই সময়ে সংবাদ আসে শাহ্ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করেছেন। এতদিনে জাহাঙ্গীর বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন। মোগল সৈন্য বাহিনী বিপুলভাবে সমাবেশ করা হল। মনসবদার ও

রাজকুমারেরা তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যদল নিয়ে কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হবার আদেশ পেলেন। স্থির হল কান্দাহার সুরক্ষিত করে বিশাল বাহিনী পারস্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবে। কিন্তু সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। শাহজাহান বর্ষার পূর্ব্বে কান্দাহার অভিযানে অস্বীকৃত হলেন এবং মাণ্ডু দুর্গ পরিত্যাগ করতে আপত্তি জানালেন। কান্দাহার যাত্রার সর্ত্ত স্বরূপ তিনি পাঞ্জাবের পরে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ প্রার্থনা করলেন।

শাহজাহানের এই দাবীর পশ্চাতে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দাক্ষিণাত্য অভিযানে যে গৌরবের অধিকারী তিনি হয়েছিলেন কান্দাহার অভিযানে সে গৌরব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে এ কথা তিনি জানতেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মোগল সৈন্যদের পক্ষে কান্দাহারের অবরোধ মুক্ত করা যে সহজসাধ্য নয়—উপরন্তু অসম্ভব হয়েই দাঁড়াতে পারে একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ পারসিক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে দীর্ঘদিন সেখানে অতিবাহিত হবে, এই অবসরে রাজধানীতে নূরজাহান তাঁর শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সব ব্যবস্থাই সুসম্পূর্ণ করবেন সে বিষয়ে শাহজাহানের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। যদি এই সময়ের মধ্যে পীড়িত সম্রাটের মৃত্যু ঘটে তবে শাহ্‌—রিয়ারকে আগ্রার সিংহাসনে স্থাপন করে নূরজাহান শাসনকার্য্য পরিচালনা করবেন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মত একটি মাত্র পথ শাহজাহানের সম্মুখে ছিল এবং তা হলো

কান্দাহার অভিযানকারী বিপুল মোগল সৈন্যের পরে সম্পূর্ণ অধিকার। কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ নূরজাহানের প্রধান শত্রু। তাঁকে আপনার শক্তির সঙ্গে মিলিত করতে পারবেন এ বিশ্বাস শাহ্‌জাহানের মনে ছিল। আসফ খাঁর সাহায্যও তাঁর পক্ষে সহজলভ্য। সুতরাং রাজকীয় বাহিনীর পরে একচ্ছত্র অধিকার এবং আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের সহযোগিতা লাভ করা যদি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

বুদ্ধিমতী নূরজাহান এই সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলেন না। তাঁর প্রভাবাচ্ছন্ন সম্রাটকে এ কথা বোঝানো শক্ত হল না যে শাহ্‌জাহান বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। শাহ্‌জাহান গত কয়েক বৎসর ধরেই রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন। তাঁর ক্ষমতা, উচ্চাশা ও গর্ব্ব প্রত্যেকের কাছেই সুপরিচিত ছিল। তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা যে সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নূরজাহান সেকথা সাম্রাটকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর এ কৌশল ব্যর্থ হল না। শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি অবিলম্বে শাহ্‌জাহানকে দক্ষিণাপথের সকল রাজকীয় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদের আগ্রার রাজদরবারে প্রেরণের আদেশ দিলেন।

শাহ্‌জাহান সম্রাটের আদেশে ইতস্ততঃ করছিলেন, এমন সময়ে সামান্য একটি ব্যাপারে বিরোধ চরমে এসে দাঁড়াল। কোনও একটি ক্ষুদ্র পরগণা অধিকারের ব্যাপারে শাহ্‌জাহান ও

নূরজাহানের সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নূরজাহান এই সংবাদ সম্রাটের কাছে শাহ্‌জাহানের প্রত্যক্ষ বিরোধের নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করেন। জাহাঙ্গীর পুত্রের এই উদ্ধত ব্যবহারে তাঁকে তিরস্কার করে পত্র প্রেরণ করেন এবং রাজ-দরবারে শাহ্‌জাহানের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করেন।

• কান্দাহার অভিযানে মিরজা রুস্তমের অধীনে শাহ্‌রীয়ার সেনাপতি পদপ্রাপ্ত হলেন। উত্তর ভারতে শাহ্‌জাহানের কতকগুলি জায়গীর সম্রাট শাহ্‌রীয়ারকে দান করলেন। শাহ্-জাহানকে তার পরিবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যে জায়গীর গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হল। কিন্তু কান্দাহার অভিযানে সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করলে দক্ষিণ ভারতে শাহ্‌জাহানের কর্ত্তৃত্ব যে নিতান্তই অসম্ভব সেকথা বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ভাগ্যচক্রের এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনে বিচলিত হ'য়ে শাহ্‌জাহান দেওয়ান আফজল খাঁকে প্রেরণ করলেন পিতার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে। পিতার নিকট লিখিত পত্রে তিনি তাঁর প্রতি এই অবিচারের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পিতাকে আপন হস্তে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু জাহাঙ্গীর আফজল খাঁকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহী পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকেন।

এই বিবাদের সময়ে আসফ খাঁ নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেন। অন্তরে শাহ্‌জাহানকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যভাবে

সম্রাজ্ঞীর বিরোধিতা করার সাহস তাঁর ছিল না। কিন্তু নূরজাহান আসফ খাঁকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। অবশেষে শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সাময়িকভাবে শত্রুতা বিস্মৃত হয়ে তিনি সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে কাবুল থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান জানালেন।

ইতিমধ্যে কান্দাহার পারস্যের অধিকারভুক্ত হয়। পঁয়তাল্লিশ দিনের অবরোধের পরে কান্দাহার আত্মসমর্পণ করে। পারস্যের রাজদূত শাহ্ আব্বাসের পত্র নিয়ে মোগল রাজদরবারে আসেন। পত্রে শাহ্ আব্বাস সম্রাটকে কান্দাহার দখল সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে পুরুষানুক্রমে কান্দাহার পারস্যেরই সম্পত্তি। সুতরাং পারস্যের কান্দাহার দখলে জাহাঙ্গীর নিশ্চয়ই অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না এবং পারস্য ও মোগলের বন্ধুত্ব এর জন্য ক্ষুণ্ণ হবে না।

জাহাঙ্গীর শাহ্ আব্বাসের দূতকে বিশ্বাসঘাতকতা ও নীচ অন্তঃকরণের জন্য তিরস্কার করে বিদায় দেন, এবং কান্দাহার অভিযানের জন্য বিরাট আয়োজনে মনোনিবেশ করেন। মিরজা কাসিমের নেতৃত্বে যুদ্ধযাত্রার সকল আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। বিহারের শাসনকর্ত্তা কুমার পরভেজ সম্রাটের আদেশ অনুসারে সসৈন্যে আগ্রার দরবারে উপস্থিত হবার আদেশ পেলেন।

এই সময়ে আগ্রায় সংবাদ পৌঁছল দাক্ষিণাত্যে শাহ্জাহান প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সসৈন্যে মাণ্ডু পরিত্যাগ করে

উত্তর ভারতে যাত্রা করেছেন। নুরজাহানের প্রতিপত্তিতে অসন্তুষ্ট দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত সেনানায়কদের প্রায় সকলেই শাহ্‌জাহানের সেনানায়কত্ব স্বীকার করে নিলেন। বৃদ্ধ খান্‌ খানান্‌, তাঁর দুই পুত্র, মেবারের রাণার পুত্র ভীম সিংহ ও তাঁর সাহসী রাজপুত সৈন্যদল প্রভৃতি সকলেই শাহ্‌জাহানকে সমর্থন করলেন। কিন্তু নূরজাহানও এতদিন নীরবে ছিলেন না। সিংহাসন রক্ষার জন্য সম্রাটের নামে তিনি সামন্তদের আহ্বান জানালেন। অম্বর, মারবার, কোটা, বুঁদি প্রভৃতি রাজস্থানের বিভিন্ন দেশগুলি সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিল। মহাবৎ খাঁ এই বিপুল সৈন্য-বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফতেপুর সিক্রীর কাছে উভয়পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাতে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেও শাহ্‌জাহানের সৈন্যদল পরাজিত হয়। শাহ্‌জাহান মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ দ্রুত মাণ্ডুর দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এর পরের প্রায় দুই বৎসরের ইতিহাস এই গৃহযুদ্ধের নিদারুণ বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। শাহ্‌জাহান মহাবৎ খাঁর যুদ্ধ কৌশলের ফলে দাক্ষিণাত্যে একান্তভাবে অসহায় হয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে তাঁর দলস্থ সেনাপতিবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় দাক্ষিণাত্যে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে অনেক বাধা ও বিঘ্নের পরে তিনি উড়িষ্যায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের কর্ত্তৃপক্ষ শাহ্‌জাহানের এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সেজন্য সাময়িক ভাবে শাহ্‌জাহান তাঁর অদৃষ্টের গতিকে ফিরাতে সমর্থ হন, এবং পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা

তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি বর্দ্ধমান অবরোধ ও দখল করেন। শাহ্‌জাহান এর পরে অযোধ্যা ও এলাহাবাদ অধিকারে উদ্যোগী হন। তাঁর সেনাপতি আবদুল্লা খাঁ এলাহাবাদ অবরোধ করেন। এই সময়ে মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী রাজকীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির সংবাদে আবদুল্লা ভীত হয়ে এলাহাবাদের অবরোধ তুলে নিয়ে ঝান্সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শাহ্‌জাহান ইতিমধ্যে জৌনপুর অধিকার করে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে শিবির ফেলেন। এখানে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শাহ্‌জাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে ভীমসিংহ ও তাঁর রাজপুত সৈন্যদল অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের পরে শাহ্‌জাহান বঙ্গদেশে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় হয়ে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু কোনও প্রকারেই তিনি আপনার হৃত সৌভাগ্যকে পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পান না। অবশেষে আর উপায়ান্তর না দেখে শাহ্‌জাহান পিতার নিকট আপনার দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করেন।

ইতিমধ্যে মহাবৎ খাঁর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে নূরজাহান আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন। সুতরাং অবিলম্বে শাহ্‌জাহানকে ক্ষমা করবার জন্য তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দেন। শাহ্‌জাহান সর্ত্ত অনুসারে রোটাস ও আসির দুর্গ সম্রাটকে সমর্পণ করেন এবং পুত্র দারা ও ঔরঙ্গজেবকে প্রতিভূ হিসাবে নূরজাহানের

তত্ত্বাবধানে আগ্রায় প্রেরণ করেন। সম্রাট তাঁকে নাসিকের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

এইভাবে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে এই গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোগল স্বার্থ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূরজাহানের সঙ্গে মহাবৎ খাঁর নূতন করে বিবাদের সূত্রপাত হল। এই বিবাদের কারণ নূরজাহান ও শাহ্‌জাহানের বিরোধের কারণেরই অনুরূপ। মহাবৎ খাঁকে তাঁর নবার্জ্জিত ক্ষমতা থেকে চ্যুত করাই সম্রাজ্ঞীর সর্ব্বপ্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

এখন পর্য্যন্তও অপদার্থ শাহ্‌রীয়ারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই নূরজাহানের মনের ঐকান্তিক বাসনা ছিল। ১৬২৫ খৃঃ রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূল ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে খসরুর মৃত্যু ঘটেছে। শাহ্‌জাহানের অসীম প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা এখন বিলুপ্ত প্রায়—রাজানুগ্রহে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। নূরজাহানের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ কেহই আর ছিলেন না।

১৬২৫ খৃঃ নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। শাহ্-জাহানের বিদ্রোহের সময়ে কুমার পারভেজ মহাবৎ খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেন। তাঁর অপদার্থতা সম্বন্ধে কাহারও মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। পারভেজ নিজেও সিংহাসন পাওয়ার আশা পোষণ করেন নি। কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন যে খসরু বা শাহ্‌জাহানের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ১৬২৫ খৃঃ তিনি দৈর্ঘতে

পেলেন—খসরু মৃত—শাহ্‌জাহান হৃতগৌরব। বিশেষতঃ মহাবৎ খাঁর মত সুদক্ষ সেনাপতির সাহায্য লাভ করা তাঁর পক্ষে এখন সম্ভবপর। শাহ্‌জাহানের সঙ্গে যুদ্ধে মহাবৎ খাঁ সকলের মনে ভীতি ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে তিনিই এখন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসাবে সম্মানিত। সুতরাং তাঁকে সাহায্যকারীরূপে পেলে সিংহাসন অধিকারে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না হওয়াই সম্ভব।

মহাবৎ খাঁ ও এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করছিলেন। নূরজাহান এবং তিনি কেহই অন্তরে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বিস্মৃত হতে পারেন নি। তিনি জাহাঙ্গীরকে স্পষ্টভাষায় অন্তঃপুরের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পারভেজ এবং নূরজাহান পরিচালিত শাহ্‌রীয়ারের মধ্যে তিনি পারভেজকেই সমর্থন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ দমনের জন্য নূরজাহান মহাবৎ খাঁর প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেইজন্য প্রথম সুযোগেই তিনি শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে ব্যগ্র ছিলেন।

আসফ খাঁ ছিলেন মহাবৎ খাঁর প্রধান শত্রু। নূরজাহান তাঁকে আহ্বান করলেন মহাবতের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য। প্রথমেই নূরজাহান মহাবতের সঙ্গে কুমার পারভেজের বিচ্ছেদ ঘটানো প্রয়োজন বোধ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাবৎ খাঁকে অবিলম্বে বাংলাদেশে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। মহাবৎ খাঁ বাধ্য হয়েই বাংলাদেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু

নূরজাহান তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। মহাবৎ খাঁর কাছে তিনি বাংলাদেশের রাজকীয় সম্পত্তির হিসাব চেয়ে পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহাবৎ খাঁকে এইভাবে সকলের চোখে অপদস্থ করে তাঁর গৌরব হ্রাস করা। মহাবৎ খাঁ সম্রাজ্ঞীর এই উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। শক্তিহীন সম্রাটের কাছে এর প্রতিকার আশা করা বৃথা। অগত্যা তিনি কয়েক সহস্র রাজপুত সৈন্যসহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর কাবুল যাত্রার পথে ঝিলাম নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। মহাবৎ খাঁ সসৈন্যে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। মহাবৎ খাঁকে সসৈন্যে উপস্থিত হতে দেখে রাজদরবারে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করার ক্ষমতা বা সাহস কাহারও ছিল না। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে দরবারে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হল। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মহাবতের উপস্থিতির অল্প কয়েকদিন পরেই রাজসৈন্য ঝিলাম নদী অতিক্রম করে। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর তাঁর পরিবারস্থ সকলে ও কয়েকজন ভৃত্য পরদিন প্রভাতে নদীপার হওয়ার জন্য প্রভাতের অপেক্ষা করতে থাকেন। মহাবৎ খাঁ এই সংবাদ পেলেন। তিনি দেখলেন সম্রাটকে আপন আয়ত্বে আনবার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হবে না। সম্রাটকে আপন আয়ত্বে পেলে সমগ্র রাজ্যের কর্তৃত্ব-ভার অতি সহজেই লাভ করা যাবে এবং সেই সঙ্গে সম্রাজ্ঞী

নূরজাহানের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অবসান ঘটবে। মহাবৎ খাঁ এক অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হলেন। জাহাঙ্গীরকে তিনি বন্দী করার উদ্যোগ করলেন। অসুস্থ সম্রাট নিজের হস্তে সাম্রাজ্যের শাসনরশ্মি পরিচালনে অক্ষম। কেহ না কেহ তাঁকে পরিচালনা করবেই, তবে মহাবৎ খাঁ কেন সেই পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন না ?

পরদিন অতি প্রত্যুষে দুই সহস্র রাজপূত সৈন্য প্রেরিত হল ঝিলামের সেতু পাহারা দেওয়ার জন্য যেন রাজকীয় সৈন্য সম্রাটের রক্ষার্থে নদীর এপারে না আসতে পারে। তারপর মহাবৎ খাঁ স্বয়ং কয়েকজন বিশিষ্ট সেনানায়কদের সঙ্গে সম্রাটের শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই ঘটনার বিবরণ প্রত্যক্ষ-দর্শী ঐতিহাসিক মোতাম্মদ খাঁ সুন্দর ভাবে দিয়েছেন। চারিদিকে একটা ভয়াবহ আর্ত্তনাদ শোনা গেল যে মহাবৎ খাঁ সম্রাটকে আক্রমণ করতে আসছেন। শতাধিক সশস্ত্র রাজপুত-সৈন্যে পরিবেষ্টিত মহাবৎ খাঁ সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করে প্রশ্ন করলেন সম্রাট কোথায়। সম্রাট তখন স্নানকক্ষে ছিলেন। মহাবৎ খাঁ সশস্ত্র প্রহরীসহ অপেক্ষা করতে লাগলেন সম্রাটের জন্য, অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে সম্রাটের কক্ষে প্রবেশের উদ্যোগ করতেই সম্রাট তাঁর কক্ষ হতে বাইরে এলেন। তিনি কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে তাঁর জন্যে অপেক্ষমান শিবিকায় আরোহণ করলেন। তখন মহাবৎ খাঁ অত্যন্ত বিনীতভাবে শিবিকার নিকটে উপস্থিত হয়ে সম্রাটকে বল্লেন যে

তিনি সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেন যে আসফ খাঁ তাঁর ধ্বংস-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সম্রাজ্ঞী সে বিষয়ে আসফ খাঁকে সহায়তা করছেন। যদি মহাবৎ খাঁকে মৃত্যু অথবা অন্য কোনও প্রকার শাস্তি দেওয়া সম্রাটের অভিপ্রেত হয় তবে সে দণ্ড তিনিই স্বয়ং দিন—মহাবৎ খাঁ সে শাস্তিকে নির্ব্বিবাদে মেনে নেবেন। ইতিমধ্যে রাজপুত-বাহিনী সম্রাটের শিবিকাকে চতুর্দ্দিক হতে ঘিরে ফেল্‌ল, নিরুপায় সম্রাট মহাবৎ খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সম্রাটকে বন্দী করার জন্য জনসাধারণ যাতে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে সেজন্য মহাবৎ এক কৌশল উদ্ভাবন করলেন। সম্রাটকে অনুরোধ করলেন শিবিকা ত্যাগ করে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হওয়ার জন্য। মহাবৎ খাঁ সামান্য দেহরক্ষী হিসাবে সম্রাটকে অনুগমন করতে চাইলেন। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে সম্রাটের প্রিয় অশ্বকে সজ্জিত করে আনা হল, সম্রাট তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে মহাবতের শিবির অভিমুখে যাত্রা করলেন। চারিপাশে তাঁর সশস্ত্র প্রহরী। মহাবৎ খাঁ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন যে সম্রাট তাঁর বন্দী নন। নূরজাহানের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি মহাবতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এইভাবে সম্রাট মহাবতের শিবিরে পৌঁছলেন।

শিবিরে পৌঁছেই মহাবৎ তাঁর নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন। সম্রাটের সঙ্গে নূরজাহানকেও বন্দী করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র প্রহরীসহ মহাবৎ বেগমের উদ্দেশ্যে যাত্রা

করলেন। কিন্তু তখন যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। শিবিরে সম্রাজ্ঞী নেই। মাত্র একজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে নূরজাহান ঝিলাম অতিক্রম করে চলে গেছেন। অপরিচিত দুইটি পথিককে সেতু পার হতে দিতে মহাবতের সৈন্যরা আপত্তি করেনি। মহাবৎ খাঁ বুঝতে পারলেন সম্রাটকে মুক্ত করার জন্য বেগম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। মহাবৎ খাঁ সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

নূরজাহান ঝিলাম অতিক্রম করে রাজকীয় সৈন্যদল ও আসফ খাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভ্রাতা-ভগ্নীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্রাটের উদ্ধারের আয়োজন হতে লাগল। যথাসময়ে মহাবৎ খাঁ এ সংবাদ পেলেন। সম্রাটও শুনলেন তাঁর উদ্ধার আয়োজনের উদ্যোগ কাহিনী। তিনি এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি করলেন। দুরন্ত ঝিলাম নদীর এপারে সহস্র সহস্র রাজপুত সৈন্য সশস্ত্রভাবে প্রহরায় নিযুক্ত। তাদের এড়িয়ে নদী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য এবং এই উন্মত্ত প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র সৈন্য নিহত হওয়া ভিন্ন আর কিছু হবে না। তিনি স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর কাছে এ আয়োজন থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য পত্র পাঠালেন। মহাবৎ খাঁ ও যুদ্ধকে এড়াতে চাইছিলেন, সুতরাং তিনি সম্রাটের অঙ্গুরীর ছাপ অঙ্কিত করে সে পত্র পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নূরজাহান তাতে তাঁর কার্য্য থেকে নিবৃত্ত হলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ সমস্তই মহাবৎ খাঁর কৌশল।

পরদিন প্রভাত হতেই উভয় পক্ষের যুদ্ধ সুরু হল। দলে দলে রাজকীয় সৈন্য নদী অতিক্রম করার বিপুল প্রয়াস করতে লাগল। কিন্তু রাজপুত সৈন্যের প্রবল বাধার সম্মুখে তারা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না। বিশেষ করে ঝিলামের প্রবল স্রোত তাদের পক্ষে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছিলেন নদীর অপর পার্শ্বে উপস্থিত থেকে। কিন্তু রাজকীয় সৈন্যের সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে গেল। আসফ খাঁ অল্প কিছু অনুরক্ত সৈন্যসহ সকলের অলক্ষ্যে পলায়ন করলেন। নূরজাহান উপায়ান্তর না দেখে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মহাবতের কাছে আত্মসমার্পণ করলেন।

নূরজাহানের আত্মসমর্পণের পরে পলাতক আসফ খাঁর বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁ সৈন্য প্রেরণ করলেন। আসফ খাঁ রাজপুত বাহিনীর কাছে পরাজিত ও বন্দী হলেন। এর পরে নিশ্চিত হয়ে মহাবৎ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে মনোনিবেশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্য এখন মহাবতের নির্দ্দেশ অনুসারেই শাসিত হচ্ছিল। জাহাঙ্গীর বন্দী, নূরজাহান ও আসফ খাঁর ক্ষমতা লুপ্ত। শাহজাহান সুদূর দাক্ষিণাত্যে শক্তিহীন। ক্রমে সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা দেখা দিল। মহাবতের প্রাধান্যে বিশেষ করে রাজপুত সৈন্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু সামন্ত নরপতিরা সকলেই গৌরব অনুভব করছিলেন। এই সময়েই দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু মালিক অম্বরের মৃত্যু ঘটে। দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি এইভাবে দীর্ঘদিনের পর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশ

লাভ করল। মহাবৎ খাঁ সম্রাটকে নিয়ে এই সময়ে কাবুল যাত্রা করলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে লুপ্তপ্রায় মোগল প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধারে তিনি মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু কাবুলের পথে মহাবতের সৈন্যদের মধ্যে একটা খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজপুত সৈন্যদের অতিরিক্ত প্রাধান্যে ক্ষুব্ধ অন্যান্য সৈন্যরা বিরোধের সুযোগ অন্বেষণ করছিল। এই সময়ে অতি সামান্য একটি কারণে উত্তেজিত হয়ে আহদি সৈন্যরা অতর্কিতে রাজপুত সৈন্যদের আক্রমণ করে। অপ্রস্তুত রাজপুত সৈন্য বাধা দেওয়ার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় না। এই বিরোধে প্রায় আট নয় শত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। মহাবৎ খাঁ অনেক কষ্টে এই বিবাদের মীমাংসা করেন বটে কিন্তু এত অধিক রাজপুত সৈন্যের মৃত্যুতে তাঁর শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়।

এই শক্তিক্ষয়ের সুযোগে মহাবতের অধীনস্থ যে সকল পুরাতন ওমরাহ্‌গণ ছিলেন তাঁরা মহাবতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হলেন। মহাবতের অপরিমেয় শক্তি ও সৌভাগ্য তাঁদের প্রত্যেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা মহামতের পরিবর্ত্তে সম্রাটকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপনের উদ্যোগী হলেন। নূরজাহান এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁদের মুক্তির সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি মহাবতের মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই কার্য্যের ভার তিনি সম্রাটের উপরে দিলেন। সম্রাট মহাবতের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি

মহাবৎ খাঁকে স্পষ্টই জানালেন যে বেগমের প্রভাব থেকে তাঁকে মুক্ত করে মহাবৎ তাঁর প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছেন। জাহাঙ্গীর এখন সম্পূর্ণ সুখী ও স্বাধীন। মহাবতের আস্থা স্থাপন করবার জন্য সম্রাট পূর্ব্বের মত শিকারে যেতে সুরু করলেন এবং দীর্ঘকালস্থায়ী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলেন। ক্রমে জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে মহাবতের সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। তিনি সম্রাটের প্রহরীর সংখ্যা কমিয়ে দিলেন এবং জাহাঙ্গীরকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করলেন। নূরজাহান এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি গোপনে ওমরাহ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। অর্থের বিনিময়ে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এইভাবে নিশ্চিন্ত মহাবতের অলক্ষ্যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে মহাবৎ খাঁ সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল থেকে লাহোরে যাত্রা করলেন। নূরজাহান লাহোরে অবস্থিত তাঁর অনুরক্ত দেহরক্ষী খোজা হুঁশিয়ার খাঁকে প্রায় দুই সহস্র সৈন্যসহ সম্রাটের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ করেন। হুঁশিয়ার খাঁ সসৈন্যে রোটাস দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পরে নূরজাহান তাঁর ও সম্রাটের অধীনস্থ সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের সমবেত করেন। মহাবৎ সহসা এই সৈন্য সমাবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সম্রাটের পরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। অতর্কিতে এই বিরাট সৈন্য সমাবেশে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এবং বুঝতে পারলেন যে নূরজাহান এবারও তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে জয়লাভ করেছেন।

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি গোপনে বন্দী আসফ খাঁ ও তাঁর পুত্র সহ পলায়ন করেন। নূরজাহান রোটাস দুর্গে দরবার আহ্বানের আয়োজন করলেন। তিনি তাঁর কর্তৃত্বভার পুনরায় গ্রহণ করলেন। এরপরে তিনি মহাবৎ খাঁকে ভীতি প্রদর্শন করে এক পত্র দেন। মহাবৎ খাঁ সেই পত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আসফ খাঁ ও তাঁর পুত্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের সঙ্গে লাহোরে বিপুল সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। রাজ্যের শাসনভার আসফ খাঁর করে অর্পিত হল।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ও সম্রাটের বন্দীত্বের সংবাদে এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আবার বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মালিক অম্বর দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্ত্তা খান জাহান লোদীকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন কিন্তু মোগল সৈন্যের সৌভাগ্যবশতঃ সহসা এই সময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন হয়। কিন্তু মালিক অম্বরের মৃত্যুতেও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের অবসান ঘটেনা। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আর একজন বীরের আবির্ভাব হয়। ইনি হামিদ খাঁ। এঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্য আবার যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের মূলে ছিল শাসনকর্ত্তা খান জাহান লোদীর অর্থলোভ। তিনি অর্থের জন্য মোগল অধিকৃত স্থানগুলি হামিদ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।

এইভাবে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্য সমস্যার এক অতি গ্লানিজনক পরিণতি ঘটে। মোগল সৈন্যের এই শক্তি হ্রাসের জন্যই মারাঠা জাতি দাক্ষিণাত্যে আপন শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল এবং পরবর্ত্তী কালে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যে জাহাঙ্গীরের এই দাক্ষিণাত্য নীতি কিছু পরিমাণে দায়ী সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মহাবৎ খাঁর সঙ্গে বিরোধের সংবাদে সৈন্যসহ শাহ্‌জাহান আহমেদনগর পরিত্যাগ করে উত্তর ভারতে যাত্রা করলেন। এই সুযোগে উত্তর ভারতের আটার দুর্গ অধিকারের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে তিনি পারস্যে পলায়নের উদ্যোগ করতে লাগলেন। এই সময়ে শাহ্‌জাহান সংবাদ পেলেন কুমার পারভেজ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত এবং ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মহাবৎ খাঁ পলায়িত। এই সংবাদে পারস্য যাত্রা স্থগিত রেখে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গুজরাটে উপস্থিত হয়ে তিনি পারভেজের মৃত্যু সংবাদ পান। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে শাহ্‌জাহানই কুমার পারভেজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। পলাতক মহাবৎ খাঁকে বন্দী করার জন্য নূরজাহান সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। মহাবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে শাহ্‌জাহানের আশ্রয় ও মিত্রতা প্রার্থনা করলেন। মহাবৎ খাঁর মত সাহসী ও সুকৌশলী সেনাপতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে তিনি বিন্দুমাত্রও বিলম্ব

করলেন না। দাক্ষিণাত্যে শাহ্ জাহান ও মহাবৎ খাঁ সম্মিলিতভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন। এই সংবাদে নূরজাহান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহাবৎ খাঁ ও শাহ্ জাহানের সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাজকীয় সৈন্যের ছিল না। নূরজাহান এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁর অতি প্রিয় স্থান কাশ্মীর যাত্রা করেন এই সময়ে। কিন্তু কাশ্মীরের আবহাওয়াতেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ক্রমে অশ্বারোহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। শিবিকায় ভ্রমণ করা ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে ভ্রমণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অবশেষে স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে সম্রাট লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। লাহোর যাত্রার পথে বরমঙ্গলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শেষবারের জন্য শিকারের ইচ্ছা তীব্রভাবে দেখা দেয়। বন্দুকের ভার একটি দেওয়ালের পরে রেখে পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে সম্রাট অনুচরদের দ্বারা তাড়িত হরিণ শিকার সুরু করলেন। এই সময়ে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। সম্রাটের জনৈক অনুচর পাহাড়ের উপর থেকে হরিণ তাড়িয়ে আনবার সময়ে সহসা পদস্খলিত হয়ে পাহাড়ের সুউচ্চ শিখর থেকে মাটিতে পড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্রাট এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। মৃত ব্যক্তির জননীকে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন এবং বিষণ্ণ-চিত্তে শিকার বন্ধ করে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁর

কেবলই মনে হতে থাকে যে ঐ হতভাগ্যের মৃত্যুর রূপ ধরে স্বয়ং মৃত্যু তাঁকে তাঁর শেষদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল। তিনি ঐ অনুচরের মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যুকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন। সমস্ত রাত্রি সম্রাট অত্যন্ত অস্থিরভাবে অতিবাহিত করলেন। তাঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসক দ্রুত লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অসুস্থ সম্রাটকে নিয়েই যাত্রা করলেন। পথে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে সম্রাট পানীয় চাইলেন কিন্তু পান করতে পারলেন না। সমস্ত রাত্রি এইভাবে অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে অতিবাহিত করে অবশেষে যখন প্রথম সূর্য্যের আলোয় বিশ্ব প্রকৃতি ভরে উঠেছে তখন "গ্রেট মোগল" জাহাঙ্গীর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ১৬২৭ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর মাত্র আটান্ন বৎসর বয়সে সুখ দুঃখ, যুদ্ধ বিগ্রহ ভরা বাইশ বৎসরের রাজত্বকাল তাঁর শেষ হয়।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাহজাহানের শুভানুধ্যায়ী আসফ খাঁ নূরজাহানকে বন্দী করলেন। দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের কাছে দ্রুত লাহোরে উপস্থিতির জন্য সংবাদ প্রেরণ করা হল। সিংহাসনের জন্য লাহোরে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, কাজেই সম্রাটের সৎকারের জন্য উপযুক্ত সমারোহের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলনা। জীবন যিনি প্রচুর আড়ম্বর ও উৎসবের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন মৃত্যুর উৎসব অনুষ্ঠিত হল তাঁর অত্যন্ত সাধারণ ও আড়ম্বরহীন ভাবে। লাহোরের কাছে দিলখুসা উদ্যানে তাঁর সমাধি হল।

নূরজাহান তাঁর স্বামীর সমাধির পরে অতি সুন্দর একটি সৌধ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। সমাধি সৌধটি রক্ত প্রস্তরের তৈরী, তার মাঝে মাঝে আছে শ্বেত প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর কাজ। ভিতরে শবাধারটি শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সমাধি সৌধের উপরে কোনও আবরণ নেই। প্রকৃতির একনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য উপাসক সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সমাধিকে মুক্ত আকাশের নীচে রাখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তাঁর সমাধির পরে রৌদ্র, শিশির ও বর্ষার দান অজস্রভাবে বর্ষিত হতে পারে।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে আগ্রার সিংহাসন নিয়ে যে স্বল্পস্থায়ী সংগ্রাম হয় তাতে শাহ্‌রীয়ার নিহত হন, নূরজাহানের সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ভাগ্য বিপর্য্যয়কে নূরজাহান শান্ত ও স্থির চিত্তেই মেনে নিলেন। সমস্ত বিলাস, উৎসব আড়ম্বর পরিত্যাগ করে শুভ্র বসন পরিহিতা নূরজাহান তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে দীর্ঘ আঠারো বৎসর নিঃশব্দে অতিবাহিত করেন। ধীরে ধীরে জনসাধারণের স্মৃতিপথ থেকে তাঁর উজ্জ্বল ইতিহাস ম্লান হয়ে এল। নূরজাহানের নামাঙ্কিত মুদ্রা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। সকলে ভুলে গেল পারস্য সুন্দরী বেগম নূরজাহানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ তেজস্বিতা। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গেই ঘটল নূরজাহানের প্রকৃত মৃত্যু।

জাহাঙ্গীরের সমাধির পাশে নূরজাহান তাঁর নিজের সমাধি নির্ম্মাণ করিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নিতান্ত

সাধারণভাবে তাঁকে সেখানে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধির পরে তাঁর নিজের লেখা একটি কবিতা আছে :-

"বর ম্যজারেমা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে !
ন্যঃ পরে পরমানা স্যুজদ্ ন্যঃ স্যতায়ে বুলবুলে ॥"

গরীব আমার এই সমাধির পরে যেন প্রদীপ না জ্বলে, ফুল না ফোটে, অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গও পাখা না মেলে, বুলবুলও গান না করে।

জাহাঙ্গীরের বৈচিত্র্যময় জীবন শেষ হল। পিতার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী সম্রাট তিনি ছিলেন না একথা সত্য, কিন্তু তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি সৌন্দর্য্যকে ভালবাসতেন। সে যুগের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ জীবন যাত্রার দিন অতিবাহিত হত বিলাস উৎসব ও কৃত্রিমতার মাঝে। সেই কৃত্রিমতাকে এড়িয়ে পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়—জাহাঙ্গীর সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। রাজ্যের কঠোরতম দায়িত্ব থেকে যখনই তিনি ছুটি পেয়েছেন তখনই তিনি চলে গেছেন সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি কাশ্মীরে। তাঁর সংস্কৃতিপূর্ণ মন সাহিত্য আলোচনায়, কাব্য-রচনায় গভীর আনন্দ পেত। প্রকৃত সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি যে তাঁর ছিল সে কথা তাঁর আত্মজীবনী থেকে বুঝতে পারা যায়। একটি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছিল তাঁর। যেখানে যে ঘটনাটি তাঁর ভাল লেগেছে—বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তাঁর অন্তরে তাকে তাঁর লেখনীর

সাহায্যে অমরত্ব দান করে গেছেন। কেবলমাত্র লেখনী নয় রং ও তুলির সমাবেশে তাদের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য। আজও সেই সব চিত্র সম্রাটের শিল্পীমন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। কোথায় কবে কাশ্মীর উপত্যকার অজস্র সুন্দর পুষ্পসম্ভারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি—কবে কোন বিচিত্র পাখীর দেহ-সৌন্দর্য্যে তাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না—প্রকৃতির সেই রূপ-সম্ভারকে তিনি অক্ষয় করে অঙ্কিত করিয়ে রেখে গেছেন অপরূপ ভাবে।

জীবনের শেষদিকে দুঃখ, আঘাত ও অসুস্থতায় তাঁর দিন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি নূরজাহানের প্রভাবের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। তারই ফলে একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের বিদ্রোহ—তারই ফলে মহাবৎ খাঁর হস্তে তাঁর অপমানজনক বন্দীত্ব।

শাহ্‌জাহানের সঙ্গে মৃত্যুকালে তাঁর দেখা হয়নি—সমস্ত সাম্রাজ্যে এসেছে বিশৃঙ্খলা—সর্ব্বোপরি অতিরিক্ত সুরাপানের জন্য তাঁর শারীরিক অসুস্থতা মৃত্যুকে আসন্ন করে দিয়েছিল।

বাইশ বৎসরের রাজত্বকালের ইতিহাসের মধ্যে তিনি উনিশ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অবশিষ্ট তিন বৎসরের ইতিহাস জানা যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে। সম্রাট হতে পারা খুব বিরাট সৌভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে তাঁর মনের প্রসারতা ও উদারতা, জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ অনেকখানিই ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়।

লেখিকার প্রকাশিত বই :

পঞ্চপ্রদীপ

ছেলেদের বাবর

ছেলেদের আওরঙ্গ্‌জীব

সিংহল কুমারী পদ্মিনী

লেখিকার পরবর্ত্তী বই :

অশোক

রাণাপ্রতাপ

হায়দার আলী

সিপাহী বিদ্রোহ

ছেলেদের হুমায়ূন

ছেলেদের আকবর

ছেলেদের শাহজাহান

মাঁলব রূপসী রূপমতী

কালিদাসের নারী চিত্র